ছায়াচারিণী

সমরেশ বসু

সাহিত্য প্রকাশ

৫/১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট

কলিকাতা—৭০০ ০০৯

এক

আশা চমকে উঠে বাইরের দিকে তাকালো।

কিন্তু রাস্তা খানিকটা দূরে। বাড়ির উঠোন থেকে দেখা যায় না। তবু শব্দটা বাইরের রাস্তার দিক থেকেই এসেছে। রাংচিতের বেড়া তেমনি অগ্রহায়ণের নতুন বাতাসে দুলছে। প্রজাপতিরা উড়ছে। তাদের বর্ণবাহার পাখায় চমকাচ্ছে রৌদ্রচ্ছটা। এই মন্দিরবহুল তীর্থক্ষেত্র, কোম্পানির আমলের সরু ঘিঞ্জি রাস্তা, পুরনো বড় বড় বাড়ি—সেকেলে বেনে শহরটার সাড়া শব্দ তেমনি ভেসে আসছে এই প্রান্তে। কাপড় কলের বয়লারের সোঁ সোঁ শব্দ তেমনি নিরন্তর যন্ত্রপ্রাণের সাড়া জানাচ্ছে। শহরের এই সীমানায়, যেখানে একদা বাগান-বাড়িগুলির তলার ভিত্ থেকে আল্‌সে পর্যন্ত বার্ধক্যে নাড়া খেয়ে গেছে অনেককাল, গতায়ু যৌবনের ভাঙা কঙ্কালে শুধু ঘুঘু দম্পতীরাই যেখানে চড়ে ও বংশবৃদ্ধি করে, যেখানে এখনো কিছু বন বাদাড় মাঠ গেছে উত্তরে ঢালুতে, নদীর সীমানায় একটি প্রায় নিখুঁত গ্রামীণ আবহাওয়ায়, নতুন দু'চারটে বাড়ি ঘিঞ্জি শহরটাকে যেখানে হাঁফ ছাড়বার ডাক দিচ্ছে, সেখানে পুরনো সেই নিম্নবিত্তের ভদ্রলোকদের পাড়াটার প্রত্যহের ঘরে বাইরের হাসি কান্না আড্ডার গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে একই রকম। শালিকের স্বভাব-কলহ, চড়ুইয়ের স্বভাব-ঝাঁপাই-ঝোড়ার কোথাও কোনো ব্যতিক্রম নেই। পাড়ার ধারে, চির-প্রবহমান ছোট নদীটি নিশ্চয় থমকে নেই। জলের নিচে শেওলার জটা-হাত স্রোতের বুকে হাত বাড়িয়ে আছে নিশ্চয় তেমনি পাতাল থেকে।

সবই ঠিক রইলো। সকালের সোনা রোদ বেলা দশটায় রইলো রুপা রুপা-ই। রাস্তার ওই শব্দটা শুনে শুধু আশার টানা টানা কালো দুটি চোখ চকিত হল। যেন ঘুম ভাঙা চমক, থতিয়ে যাওয়া বিভ্রম,

অনেকদিনের প্রতীক্ষা করার একটি আশা নিরাশার সহসা সংশয়ে থমকে গেল। বাঘ কিংবা ব্যাধ অথবা ফিরে আসা হরিণের পায়ের শব্দে সংশয় চমকিতা হরিণীর মতো অদৃশ্য রাস্তাটার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো আশা উঠোনের মাঝখানে। কুয়ো-পাড় থেকে ধুয়ে নিয়ে আসা বাসনের পাঁজা তার হাতে। বাসি বিনুনীর তলায় পুরনো কালো ফিতের ফুঁপরি বাতাসে উড়ছে সাপের চেরা জিভের মতো। কাল বিকেলে পরা ছোট কুমকুমের ফোঁটাটি এখন কুয়াশা ঢাকা তারার মতো অস্পষ্ট। ওর চোখে না লাগা বাড়ন্ত আঠারোর ছিপছিপে শরীরে দশহাত ডুরে শাড়িটি, গাছ কোমরের পুরো পাকের আগেই কষিতে মুখ গুঁজেছে। আসলে ওর আড়ষ্ট শরীরে শাড়ির ডোরাগুলিও যেন থমকে রয়েছে। লাল জামার যে সাদা-ফুলগুলি নড়াচড়ায় সব সময় ফোটে, দল মেলে, তারাও নিথর। ওর সাধারণ ঠোঁটের চুপি চুপি খোলার অস্পষ্টতায় ঝকঝকে দাঁতের অসাধারণ মুক্তাদ্যুতি। অতি সাধারণ নাক আর গোটা মুখ জুড়ে অতি সুলভ বড় কালো, ছেলেবেলায় কৃমিকীটে খাওয়া শুধু অসাধারণ স্বপ্ন দেখা ভাবিনী দুটি চোখে, আশা তাকিয়ে রইলো অবাক হয়ে।

আর ওকে দেখে অবাক হল শান্তি বিরক্তও হল ওর ছত্রিশ বছরের মা রান্নাঘরের দরজায় অধৈর্য অপেক্ষায়। ভ্রূকুটি করে জিজ্ঞেস করলো, কী হল ?

মায়ের দিকে ফিরল না আশা। প্রায় চুপি চুপি বলল, মোটর-গাড়ির শব্দ।

মোটরগাড়ির শব্দ ? অ্যানিমিয়া-আক্রান্ত সাদা চোখে ও সকালের খাওয়া পানের পিক-শুকনো ঠোঁটে বিরক্ত রাগ হয়ে দেখা দিল ওর মায়ের রুষ্ট সন্দিগ্ধ চোখে মেয়ের আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বললো, মোটরগাড়ির শব্দ তো কী হয়েছে ?

এতেই আশার ফিরে ফেরা উচিত ছিল। কিন্তু ফিরলো না।

প্রায় তেমনি করেই বললো, এ রাস্তায় তো আর গাড়ি যায় না আজকাল ?

ছত্রিশ বছরের শাস্তি ছেষট্টির মতো রুক্ষ ঝংকার দিয়ে উঠলো, আর যায় না, আজ যাচ্ছে, তাতে হলটা কী, অ্যাঁ ?

এবার আর একবার চমকালো আশা। এক চমকে সে কয়েক মুহূর্ত আড়ষ্ট হয়েছিল। সে যেন কোথায় হারিয়ে গিয়েছিল। বেমানান হয়েছিল এখানে। আর এক চমকে সে এখানে ফিরে এল। মিশে গেল, সারা শরীর ত্রস্ত সুরে কথা বলে উঠলো নিঃশব্দে। গায়ের ডোরাগুলি কিলবিলিয়ে উঠলো। ত্রস্তে নড়ে ওঠা সাপের মত বেণীটা ছিটকে গেল একদিক থেকে আর একদিকে। মায়ের দিকে তাকিয়ে এক ছুটে সে রান্নাঘরে।

শান্তি টেনে বলল, ঢঙ্! ছেলেদের ইস্কুলের ভাত নিয়ে বসে আছি, বেড়ে দেবার জায়গা পাচ্ছি'ন। বাসনের গোছা হাতে নিয়ে ও মোটর-গাড়ীর শব্দ শুনছে। যেন একেবারে কী শুনছে! শাঁখ বাজিয়ে টোপর মাথায় দিয়ে গাড়ি নিয়ে আসছে নাকি কেউ ?

মায়ের বিদ্রূপে আশা অপ্রতিভ হল না। কেমন একটি হাসি ওর ঠোঁটের কোণে চুপি চুপি লুটিয়ে পড়ে রইলো। বাসনের জল ঝাড়তে ঝাড়তে বললো, সত্যি, এমন চমকে গেছি !

ক্লাস সেভেনে পড়া চোদ্দ বছরের ক্ষয়াটে ভাই শ্যাম ওর চুলেব আল্‌বোটে আল্‌গোছে আঙুল ঠেকিয়ে বললো বুড়োটে গম্ভীর গলায়, তুই ভাবলি তোর বর আসছে, না ?

রাগ করলো না আশা। ভাইকে ভ্যাংচাল একটু জিভ বার করে একটু বা কপট রাগের ভাব দেখিয়ে।

আর আট বছরের রাম বললো, ফটিকদা মোটরগাড়ি নিয়ে আসছে তুই ভেবেছিস; না ?

মুখ গম্ভীর করলো আশা। কিন্তু চুপি চুপি হাসিটা চুপি চুপিই বোধহয় রাগের ছদ্মবেশে ছড়িয়ে রইলো ওর কটাসে মুখের চকিত রক্তাভায়। মনে মনে বললো, অসভ্য।

শান্তি ভাত বেড়ে ধমক দিল, এই চুপ করে ভাত খেয়ে ইস্কুলে বেরো শিগ্‌গির।

তবু ছেলেদের সামনেই ঠোঁট উল্‌টে শান্তি না বলে পারলো না, লোহাকলের মস্ত চাকুরে ফটিক বাঁড়ুজ্জেই এবার আসবে মোটর হাঁকিয়ে, হুঁ!

লোহাকলের সামান্য চাকুরে বলেই এ বিদ্রূপ, না কি আঠারোর গলার কাঁটাটার যন্ত্রণা মায়ের, বোঝা গেল না। যদিও অনেক অস্বস্তি এবং লজ্জার বিষয় ছিল কথায়, তবু মা এখন রেগে গেছে, এ ছাড়া ভাববার কিছু নেই। আশা উঠে পড়ে বললো, মা আমি চান করতে যাচ্ছি।

শান্তি তীক্ষ্ণ গলায় এক রাশ ঝাঁজ ছুঁড়ে দিল, দশ ঘণ্টা জলে ডুবে এস না যেন। আর নদীতে যেতে পথেঘাটে বেলেল্লাপনাটাও একটু কম করো।

বাইরে এসে যেন মাকে ক্ষমা করে হাসলো একটু আশা। পথেঘাটে বেলেল্লাপনা কিছু করে না সে! আসলে অন্য কথাই বলতে চেয়েছে মা। মুখ ফুটে সেটা বলতে পারে না। যে কথাটি এখন এ পাড়ার চাকের মুখে মধু জুটিয়েছে।

রাম আবার বললো, দিদিটার আজকাল খুব ঢং হয়েছে।

সঙ্গে সঙ্গে মায়ের একটি চাটি পড়ল তার মাথায়। বললো, তোকে এসব পাকা পাকা কথা কে বলতে বলেছে রে হারামজাদা। খেয়ে ইস্কুলে বেরো তাড়াতাড়ি।

এক বিনুনী বুকের ওপর টেনে বাংচিতের বেড়াটার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো আশা।

বিনুনী খুলতে খুলতে তাকালো রাস্তার দিকে। রাস্তাটা দেখা যায় না। শুধু সরু গলি-পথটা কয়েকটি বড় বাড়ির মাঝখান দিয়ে বুকে হাঁটা সাপের মতো চলে গেছে। মোটরগাড়ির শব্দটা আর নেই। তবু আশার মনে হল, শব্দটা তার কানে লেগে রয়েছে।

এমনও হয়। মানুষের মনটা বুঝি এমনি। কত মোটরগাড়ির শব্দ শুনেছে আশা তার জীবনে। কিন্তু আজকের শব্দটা কেমন একরকম করে যেন তার কানে বাজলো। এমন চমকে দিলে! যেন সে কোনদিন মোটরের শব্দ শোনেনি। ওইটুকু সময়ের মধ্যে, কয়েকটা মুহূর্তে, সে চমকে গেল, থতিয়ে গেল, হাসি পেল, তবু ভয় পেল আবার দুঃখ হতে লাগলো। এতগুলি অনুভূতির সমাবেশ যে হয়েছে কয়েক লহমায়, সেটাও তার নিজের কাছে বিশ্বাসযোগ্য নয়। না তো বিরক্ত হবেই। অমন করে কেউ চমকায় শুধু শুধু?

হেসে ফেললো আশা। সেলাই মেশিনের দ্রুত ছুঁচের মত তার আঙুল বেণীর বন্ধনে বন্ধনে ওঠা পড়া করতে লাগলো আর নিটট বেণীটা খুলে ছড়িয়ে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো চুলের গোছা। যেন নিজেকেই ঠাটা করে দুষ্টু হেসে রাস্তাটার দিকে তাকালো আশা।

অগ্রহায়ণের রোদে কী মায়া লেগেছে রাংচিতের গাঢ় সবুজ পাতায় পাতায় কে জানে। দু'তিনটে প্রজাপতি অস্থির পাখায় উড়ছে বসছে, উড়ছে। মৌমাছির মত ওরা ফুলের খোঁজে বেড়ায় না কিংবা ভোমরার মত। খালি পাতায় পাতায় ফেরে। যার যাতে টান। কচিপাতা খায় প্রজাপতিরা, ফুলের রেণু খায়। উঠোনের উত্তরে কাঁটাগাছের পাতাগুলি যেন কান খাড়া করে আছে। কৃষ্ণকলির ঝাড়ে কাল সন্ধ্যেয় ফোটা ফুলগুলি দিনের আলোয় গেছে শুকিয়ে। সূর্য-পত্নী ছায়ার মত প্রতীক্ষা বা ওদের, কখন সে পৃথিবী পরিক্রমা করে ফিরে আসবে। অদৃশ্য সূর্য-প্রেয়সী ছায়ার ওরাই বুঝি নিঃশব্দ বহিঃপ্রকাশ।

আড় চোখে রান্নাঘরের দিকে একবার লক্ষ্য করে ঠোঁট টিপে তেমনি হাসলো আশা। কিন্তু একটু ভ্রূকুটি করে। নিজেকেই যেন কপট সুরে ধমকালো, ও আবার কেমন ভুতুড়ে চমকানো? মাঝখান থেকে বকুনি খেয়ে মরতে হল। না হয় ও-রাস্তায় মোটর যায় না। এক সময়ে করাত কলে ছোট লোহার কারখানায় মোটর যেত ওই

রাস্তাতেই। তারপর যুদ্ধের সময় থেকে, রেল স্টেশন থেকে নতুন রাস্তা হয়ে ইস্তক, এটা বাতিল হয়ে গেছে। পুরনো সদর এখন অন্দর। দুপাশে ঘন বুনো কুল খেজুর আর বনশিউলীর ঝাড়ে ভরে গেছে। রাস্তার ওপরেও ঝাঁপ খেয়ে পড়েছে। পুবে পশ্চিমে রাস্তাটার উত্তরে নদী। এখনও ও-রাস্তায় গরুর গাড়ি যায়। কাছেই নদীর ওপর পুল। ওপারের গ্রাম থেকে পুল পেরিয়ে শহরে ঢোকার এইটিই সংক্ষিপ্ত পথ। সাইকেল রিক্‌শা গরুর গাড়ি যাওয়া আসা করে। কিন্তু মোটরগাড়ি আর যায় না। এ পাড়ায় আগে ঘন ঘন গাড়ির শব্দ শোনা যেত। এখন আর শোনা যায় না।

না-ই বা গেল। বাড়ি থেকে দু পা বাড়ালেই যে-শব্দে কান পাততে দায়, সেই শব্দ শুনে এমন চমকায় কেউ কখনো। এ যেন অলৌকিক, ভয় ধরানো খারাপ বাতাস লাগা থমকানি। জেগে জেগেই স্বপ্ন দেখার মত। যে-স্বপ্নের কোনো স্মৃতি নেই, অস্পষ্ট, কুহেলিকা। হাসিও পায় অস্বস্তিও হয়।

মানুষের এক একটা ব্যাপার কেমন হয়ে যায়। তার জন্যে অমন বকুনি খেতেই হয়। মাঝখান থেকে শ্যামটা ফোড়ন কাটলে। সেটা এমন কিছু নয়। রামটা আরো পাজী। ফটিকদার নামটা বলে মা'কে আরো রাগিয়ে দিলে। যে-নামটা যে-কোন সময় বিপর্যয় সৃষ্টি করতে পারে। রাগাতে পারে, হাসাতে পারে, কাঁদাতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে বিদ্রূপ করতে পারে। একটা নাম কত কি করতে পারে। সেই নামে ধরে বাঁশি বাজানোর মত, গুরুজনের মাঝে বড় ভয়। যে-নাম শর হয়ে বেঁধে, শরীরকে বিবশ করে, ধরা পড়িয়ে দেয়।

আশার সারা মুখ জুড়ে যে-বিশাল কালো দুটি চোখে অগ্রহায়ণের রোদের মত কৌতুক ঝিলিক দিচ্ছিল, সেখানে বুঝি বা রাংচিতে ঝাড়ের ছায়া পড়লো। হাসিটুকু বিষণ্ণ হয়ে উঠলো ঠোঁটের কোণে। মনে পড়লো, তিন দিন ফটিকদার সঙ্গে দেখা হয়নি। শুধু মায়ের

রাগ নয়; তার মতি-চাপা মনটাকে খুঁচিয়ে দিলে। তিন দিন ফটিকদা'কে দেখতে পায়নি আশা। মানুষের মনকে ধিক।- আঠারো বছরের চোরা মনকে আরো ধিক। কেন না, এখন আশার মনে পড়লো, এই তিন দিন সে অনেকবার অনেক রকমে চমকেছে। যাকে রোজ দেখতে ইচ্ছে করে, তাকে তিনদিন না দেখলে বোধহয় এমনি চমকায় মানুষ। সে এরোপ্লেনে আসবে কি মোটরে আসবে; তা' কে জানে। মোটরে এরোপ্লেনে আসা সম্ভব কি না, তা-ই বা কে ভাবছে। নিজেকে হারাবার জন্যে যে-মেয়ে মনে মনে কান পেতে থাকে, সে শুধু চমকায়। এই চমকানোটা তার সংসারের সঙ্গে লুকোচুরি খেলা! ধরা পড়লে ধমক খেতে হয় বৈ কি!

বেণী খুলে ঘরে গিয়ে খানিকটা নারকেল তেল মাথায় তালুতে আর খানিকটা গোড়ার গুছিতে মাখিয়ে, গামছা কাঁধে ফেলে আশা নদীর পথ ধরল। নদী ছাড়া গতি নেই। কুয়োর জলে চান করতে ইচ্ছে করে না।

কিন্তু আবার সেই গাড়ির শব্দ। সরু গলিটা পার হয়ে আশা বড় রাস্তায় পড়তেই, দেখতে পেল গাড়িটাকে। এই গাড়িটার শব্দই সে শুনতে পেয়েছিল কি না কে জানে। দেখল, পশ্চিম দিক থেকে নীল রংএর গাড়িটা বনশিউলীর ঝাড়ে ঝাপ্‌টা খেতে খেতে আসছে! এই গাড়িটাই তখন নিশ্চয় এসেছিল, এখন ফিরে যাচ্ছে। আপদ গাড়ি। শুধু শুধু চমকে দিয়েছিল তাকে। ফটিকদা মোটরে করে আসবে, একথা কোনদিনও আশা ভাবেনি। আশা দাঁড়ালো। গাড়িটা চলে গেলে সে রাস্তা পার হবে।

কিন্তু গাড়িটা চলে যেতে যেতেও যেন দাঁড়িয়ে পড়লো তার সামনে। চশমা চোখে একটি মুখ বার হল ভিতর থেকে। আশা পালাবে কি না ভাবছে। আশেপাশে কেউ নেই। লোকটি ডাকলো, খুকী।

খুকী? কী অসভ্য! মা আর বাবাই একমাত্র ওই নামে তাকে

ডাকে। লোকটা তাকে খুকী ভাবল? সে ফিরে তাকাল সংশয় সন্দেহ জিজ্ঞাসু চোখ তুলে।

লোকটি জিজ্ঞেস করলো, আচ্ছা, এই যে পেছনে, দুটো বাড়িব আগে, একটা দোতলা-বাড়ি রয়েছে, ওটা কি খালি?

বুঝতে পারলো আশা, বিনোদ ভট্টাচার্যের বাড়ির কথা বলছে লোকটা। যাদের বাস-বাড়ি শহরের ঘিঞ্জিতে। পুবে নদীর ধারে যাদের ধানকল আছে। ততক্ষণে সে লোকটার মুখ দেখে নিয়েছে। কালো, চওড়া মুখ আর দামী জামা পবনে। ভিতরে ড্রাইভাব ছাড়া আরো একজন রয়েছে। সেও তাকিয়ে রয়েছে তার দিকে।

আশা বলল, হ্যাঁ।

—কাদের বাড়ি জান?

—বিনোদ ভট্চাযের।

—কোথায় থাকেন?

—বারো মন্দিরের গলিতে।

লোকটা মুখ ঢুকিয়ে নিল ভিতরে। কী যেন বলাবলি করলো নিজেদের মধ্যে। তারপর চলে গেল। আশা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো। তাকিয়ে হেসে ফেললো। এই জন্যেই বোধ হয় আশা চমকে উঠেছিল। আগের থেকে জানান দিয়েছিল যেন, তার সঙ্গে গাড়িটার দেখা হবে, কথা হবে। তবুও সে গাড়িটাকে জিভ না ভেংচে পারলো না।

রাস্তাটা পার হলেই বাগান। বাঁ দিকে পুরনো একটি দোচালা মন্দির। পাশেই ঝুড়ি নামা বট গাছ। জায়গাটার নাম সতীদাহতলা। লোকে বলে সতীতলা। একমাত্র সেখানেই একটু আশা ছিল আশার। নইলে এ সময়ে চান করতে না এলেও চলতো। লোহা কারখানার হাজিরাবাবুর এ সময়েই একটু চা খাওয়ার ছুটি। কিন্তু মন্দিরের দাওয়া শূন্য। বটের ছায়ায় এই মুহূর্তে একটি কাকপক্ষীও নেই। তিনদিন পাব হয়ে, চারদিনেও আজ সেই সাইকেলের চেনা বেল ক্রীং ক্রীং করলো না।

বাগান পার হয়ে আশা নদীর ধারে এসে পড়লো। বাঁধানো ঘাট কোনো এক কালে ছিল। ভাঙা ঘাট এখন ওপরে উঠে গেছে। অত উঁচুতে আর জল ওঠে না। নদী গহীন কিন্তু ছোট। এপারে ওপারে ডেকে কথা বলা চলে। গহীন আর খরস্রোতা নদী। টলটলে জলের নীচে দেখা যায় সহস্রবাহু শেওলা। স্রোতের টানে হেলে পড়ে কিলবিল করছে। যেন লাখো লাখো ডাকিনীরা ওৎ পেতে আছে নীচে। তাদের এলো চুলের জটা লকলক করছে জড়িয়ে বাঁধবার জন্যে।

এ ঘাট এখন কলমুখর। ঘোড়ার-গাড়িওয়ালারা কেউ কেউ এসেছে ঘোড়া চান করাতে। গরু মোষও নেমেছে জলে। আর একদিকে মানুষ। জল থেকে কে যেন ডাকলো আশাকে। আশা দেখলো পদ্ম। পাড়ার মেয়ে—আশার বন্ধু।

পদ্ম জল ছিটিয়ে দিল আশার গায়ে। আশা শিউরে ডুকরে হেসে জলে পড়লো।

এ সময়ে আশা রোজই জলে ঝাঁপাই-ঝুড়তে আসে। কিন্তু আজ আশার ভাল লাগছে না। যদিও সে সাঁতার কাটলো। পদ্মকে জলের ছিটা দিল। ওদের হাসি কলতানে স্রোতস্বিনী নদী আরো খর হল, শিউরলো, হাজার হাজার মুক্তোকণা ছিটিয়ে ছড়িয়ে লোকেদের চিরকালের মনে দ্যুতি হানলো, তবু বিরক্ত করলো।

তারপরে আশাই আগে উঠে পড়লো জল থেকে। আজ জলে ডুবতে ভাল লাগছে না। আজ দেরী করে বাড়ি ফিরে মায়ের বকুনি খেতেও ভাল লাগবে না। আজ তেমন দিন নয়, এক-একদিন যেমন হাজার শ্লেষ করলে, বকলেও গায়েই লাগে না।

ওর ভেজা শাড়ি ছপছপিয়ে উঠলো চলতে গিয়ে। ভেজা শাড়ির ডোরাগুলি ওর ভেজা গায়ে জড়িয়ে ধরে, স্পষ্ট রেখায়, অস্পষ্ট বাঁকে কেমন একরকমের অলঙ্কার হয়ে উঠেছে যেন। ভেজা ডোরারও দ্যুতি আছে। সে দ্যুতি নিংড়ে নিংড়ে পড়ছে যেন। চুল মুছতে মুছতে,

অন্যমনস্ক হয়ে চলছিল আশা। এমন সময় শুনতে পেল শব্দটা। কিন্তু মুখ ফেরালো না। আবার শুনতে পেল। আর প্রথমেই ওর শান্ত সুদূর চোখ দুটিতে নিকট হল অভিমান, ঠোঁটে ঠোঁট টিপে হাসি বন্ধ করতে গিয়ে বুঝলো হাসি নয়, কান্না পাচ্ছে আশার।

সাইকেলের বেল্ আবার অধৈর্য হয়ে বেজে উঠলো, ক্রীং ক্রীং।

এসব জানতো না আশা। দু'বছর ধরে জানতে হচ্ছে। খেতে না পাওয়ার দুঃখ কিছু অজানা নয় আশার। বাবা মা ভাইদের দুঃখে দুঃখিত হওয়া, অকল্যাণের আশঙ্কায় শঙ্কিত হওয়া তার জন্মগত। কিন্তু আর একটি লোক, যাকে জন্ম থেকে দেখেনি, পরিচয় মাত্র কয়েক বছরের, তাকে তিন দিন না দেখতে পেলে, কান্না চাপতে হয়। জীবনে এসব নতুন পাঠ নিতে হচ্ছে তাকে।

অধৈর্য ক্রীং ক্রীং শব্দ কান্না উড়িয়ে নিল তার। শুধু তার মুখ জুড়ে দিঘী-চোখে, অগ্রহায়ণের রোদের মতই অভিমানের ঝিলিক দিয়ে রইলো। এগিয়ে গেল সে। কারণ মন্দিরের আড়াল ছেড়ে ফটিক সামনে আসতে পারবে না। লোকে দেখবে। যদিও, লোকের দেখার বাকী কিছুই নেই। আর, বন্ধ ঘরের ফুটোয় কিছু আলো দেখেই লোকেরা বুঝতে পারে, ঘরে কত আলো।

দু'হাতে সাইকেলের সীট্ ধরে দাঁড়িয়ে ছিল ফটিক। অতি সাধারণ চোখ মুখ, সাধারণ মাপের কালো ফটিক। মাথার চুলে একটু হাল ফ্যাশানের তৈরী ঢেউ, যদিও বাসী চুলে সেটা খুব সুবিধের হয়নি। মুখে কিছু দৃঢ়তার ছাপ, ঠোঁট দুটিতে যেন একটু দুর্বিনীতের বাঁকা রুক্ষতা। স্বচ্ছ চোখ দুটিতে কোনো কিছু চাপবার মুন্সীয়ানা অনায়ত্ত। শার্টের ওপরে সোয়েটারের বুনোন খানে খানে খুলতে আরম্ভ করেছে।

বললো, রাগ হয়েছে বুঝি?

মাথা নিচু রেখেই চোখ তুলে একবার তাকালো আশা। বললো, না।

আশা ভেজা গায়ে গামছাটা আর একটু ভাল করে টেনে দিল।

ফটিক বলল, তবে? আসছিলে না যে?

বলে হাত বাড়িয়ে ফটিক চিবুক ধরতে গেল আশার। আশা মুখ সরিয়ে নিল। বলল, রোজই এসেছি।

এ যে অভিযোগ, তা বুঝলো ফটিক। বললো, সেদিন তোমার মা এমন ক্যাট্ ক্যাট্ করে কথা শুনিয়ে দিলে। আমার ভীষণ রাগ হয়েছিল। তোমাদের বাড়ি তো আর যাবই না। ভেবেছিলাম, এখানেও আর আসব না।

আশার মুখ গম্ভীর হল আরো। বললো, এলে কেন তবে?

ফটিক চঞ্চল। পা ঘষছে, শরীর দোলাচ্ছে, হাত নাড়ছে। যেন নিজের ওপর বিরক্ত হয়ে বললো, থাকতে পারি না যে! না, সত্যি, কী এমন খারাপ ছেলেটা হ'য়ে গেছি যে, অত কথা শুনতে হবে।

আশা বললো, সে দোষ বুঝি আমার?

ফটিক বললো, বউদির ভাবখানা যেন কী এক দিগগজ বড়লোকের সঙ্গে মেয়ের বে' দেবেন।

ফটিক আশার মা'কে বলে বউদি আর বাবাকে বলে নরেনদা। পাড়াতুতো দাদা বউদি। ছোটবেলা থেকে বলে এসেছে।

আশা বললো, মা কত কী ভাবে। ভাবলেই বা কী আছে। তা ছাড়া মাকে নানান জনে নানান খানা করে বলে। রাগ হয়ে যায়, তাই বলে। এতকাল পরে তোমার যদি ওসব কথা এত গায়ে লাগে, তাহলে আর এস না।

একবার চোখ তোলবার চেষ্টা করলো আশা। বলল, শীত করছে, যাই।

আশার দিঘী-চোখ যেন আরো বড় হল। যেন বেলা শেষের ছায়ায় নিঝুম নিস্তরঙ্গ, ঝোপে ছাড়ে পাখিডাকা দিঘীটার কূলকিনারা ঠাহর করা যায় না।

আশার কথা কানে না তুলে ফটিক বললো, পাড়ার লোকে

ক'বছর ধরেই বলছে। কবে কোনদিন একটু সিনেমায় গেছি তোমাকে নিয়ে, একটু নদীর ধারে বেড়িয়েছি। কী এমন বেলেল্লাপনা হয়েছে যে দেখা হলেই ঠারে ঠোরে সেকথা শোনাতে হবে। আর প্রেম বুঝি একলা ফটিকই করে পাড়ার মধ্যে ? তা নয় আমি যদি বড় চাকুরে হতাম নয়তো বিনোদ ভট্টচায্যিদের বাড়ির ছেলে হতাম—

ততক্ষণে আশা পা বাড়িয়েছে।

ফটিক বললো, চলে যাচ্ছিস্ ?

এতক্ষণে অকৃত্রিম সম্বোধন বেরুলো তার মুখ দিয়ে। বুঝি সংবিত ফিরলো, আর সাইকেলসহ আশার কাছে এগিয়ে এল !

আশা বললো, ও কথাগুলো আর কতক্ষণ শুনব দাঁড়িয়ে। এসব কথা তুমি মাকে বলো।

ফটিক হাত বাড়িয়ে আশার ভেজা হাত চেপে ধরলো। যদিও আশা শক্ত আড়ষ্ট। ফটিক ঠোঁট বাঁকিয়ে, মাথা ঝাড়া দিয়ে বললো, আমার বয়ে গেছে ওসব বলতে। তোকে নিয়ে সোজা কলকাতা রেজেস্ট্রি অফিসে যাব, ফিরে এসে আর ও-বাড়িমুখো নয়।

আশা ফটিকের চোখের দিকে তাকালো। ফটিক আশার শক্ত শরীরটাকে আরো কাছে টেনে বললো, তাকিয়ে রইলি যে ?

আশা বললো, ও কথাটা আর কতদিন শুনব ?

—কোন্ কথাটা ?

-- এই রেজিস্ট্রি অফিসে যাওয়া ?

—দাঁড়া না সব খোঁজ খবর নিই আগে ! শেষটায় বেঘাটে গিয়ে পড়ব ?

আশা বললে, তা নয়, তুমি চাও, বাবা মা বেশ তত্ত্ব করে তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে দিক। তা সে রাজপুত্তুর এলেও কোনোদিন হবে না।

ফটিক প্রায় ভেংচে বললো, তোর কানে কানে আমি বলেছি সে কথা, না ?

বলে সে আরো কাছে টানলো আশাকে। আশার ভেজা শরীর তার শুকনো জামা ভিজিয়ে দিল।

আশা বললো, তাই তো। তা নইলে ওসব ভেবে তিনদিন দেখা না দেবার কারণ কী? সরো, তোমার জামা ভিজছে।

—ভিজুক।

এবার আশাও ভেংচে বললো, ভিজুক। এ তিনদিন সেকথা মনে ছিল না, না?

ততক্ষণে ফটিক আশার চিবুক তুলে ধরে, তার ঠোঁটের গন্তব্য ও চোখের দৃষ্টি একাগ্র করেছে।

আশা বললো, কী হচ্ছে? কেউ আসে যদি এদিকে?

ফটিকের আবার সংবিত ফিরলো। বিভ্রান্ত চোখে সে এদিক ওদিক ফিরে তাকালো। যদিও গুটিকয় শালিক ছাড়া আপাতত সাক্ষী কাউকেই দেখা যাচ্ছে না।

আশার চোখে আবার রৌদ্রচ্ছটা ঝিকমিক করে উঠলো। সে হেসে বললো, জান, আজ একটা মোটরগাড়ি এসেছিল এ পাড়ায়।

ফটিকও প্রায় আশার মায়ের মতই অবাক হয়ে বললো, মোটর-গাড়ি এসেছিল? তাতে কী হয়েছে?

আশা বললো, আজকাল এপাড়া দিয়ে আর মোটবগাড়ি যায় বুঝি?

ফটিক বললো যায় না। আজকে গেছে, তাতে কী?

—এমন চমকে গেছলাম। শব্দ শুনে বুকের মধ্যে কেমন যেন করে উঠেছিল, সত্যি।

ফটিক অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিল আশার মুখের দিকে।

আশা ফিস্‌ফিস্ করে বললো, সত্যি, রাগ হোক যাই হোক, তুমি এমন করে আর গাপ্ খেয়ে থেক না।

ফটিক হেসে ফেললো। শালিকগুলি যেন ভয় পেল, সহসা ডাক দিয়ে উড়ে গেল। ডাক ভেসে এল রাস্তার ওপর থেকে, ফটিক, টাইম হয়ে গেছে।

ডাক দিয়েছে ফটিকের বন্ধু কার্ত্তিক। দুজনে একই কারখানায় কাজ করে।

চা খাওয়ার ছুটির পরে, কার্তিকের ডেকে নিয়ে যাবার কথা।

ফটিক বললো, চলি। বিকেলে পারিস তো পদ্মদের বাড়ি বেড়াতে যাস।

চলে গেল ফটিক। আশার গায়ের কাপড় প্রায় গায়েই শুকোবার দশা। আর একবার জলে যেতে তার ইচ্ছে করলো। কিন্তু অনেক দেরী হয়ে যাবে। মা রাগ করবে। যদিও ভেজা কাপড় গায়ে এত শুকোল কেমন করে, সেটাও মায়ের চোখে পড়তে পারে। কারণ কতখানি পথে আসতে কাপড়ের জল কতটুকু ঝরে, মায়ের সে হিসেব জানা আছে।

কিন্তু হাঁসের গায়ে জল লেগে থাকে না। তিনদিন পরে, আজ এখন আর কোনো বকুনি আশাকে ছুঁতে পারবে না। মন তার উজান-গামিনী এখন। ফটিকের ঠোঁটের ও চোখের একাগ্র গন্তব্যগুলি আশার নিজের রক্তে দপ্‌দপ্‌ করতে লাগলো। বাড়ি গেল সে। মাকে দেখতে পেল না! কাপড় ছেড়ে, মাথায় চিরুনি দিতে দিতে একটা পাখির ডাক শুনে, শিস্‌ দিয়ে ভেংচে উঠলো আশা। পরমুহূর্তেই ঠোঁট টিপে ধরলো। মা শুনলেই ধমক দেবে। মেয়েমানুষের শিস্‌! কিছুতেই মনে থাকে না আশার।

কিন্তু দু'দিন পরে আবার সেই মোটরগাড়ির শব্দ। যদিও কালকেই ফটিকের সঙ্গে দেখা হয়েছে। আশা চম্‌কে দাঁড়ালো। শান্তিও আজ রান্নাঘরে যেতে গিয়ে থম্‌কে গেল। একটা নয়, প্রায় কন্‌ভয় যাচ্ছে বলে মনে হল। এক সঙ্গে কয়েকটি গাড়ির গর্জন এবং বিভিন্ন সুরের হর্ন বেজে উঠলো। সেই সঙ্গে অনেক লোকের গুঞ্জন।

আশা স্নান করতে যাবার আগে বেণী খুলছিল। মায়ের সঙ্গে চোখোচোখি হতেই সে বললো, দেখে আসব মা?

হ্যাঁ কি না শোনবার আগেই আশা বাড়ির বাইরে। রাস্তায় এসে সে হা করে তাকিয়ে রইলো। চারটে গাড়ি রাস্তার ওপরে পর পর দাঁড়িয়ে পড়েছে। পরশুর দেখা সেই গাড়িটা সকলের আগে। তারপরে আর একটা। তার পরের দুটি বড় গাড়ি। একটিতে প্রায় দশ বারোজন মেয়ে পুরুষ। আর একটি গাড়ি ঢাকা, পুলিসের গাড়ির মত।

ততক্ষণে আশার কানে, প্রায় বাতাসের আগে এসে ঢুকলো, ফিল্‌ম। ফিল্‌মের লোকেরা এসেছে। ফিল্‌ম তুলবে। কিন্তু এ ঢাকা গাড়িটা কিসের? ও দাদারা, এ গাড়িটা কিসের মশাই? সাউণ্ড ভ্যান্?

আশা দেখলো, প্রথম গাড়িটা থেকে সেই ভদ্রলোক নেমেছেন। সেই কালো চশমা চোখে ভদ্রলোক। প্রথম দিনের দেখা। আরো কয়েকজন নেমেছে। আশা দেখলো, বিনোদ ভট্‌চাযের মেজ ছেলে হরিশ তাদের কী বলছে, উত্তরের রাস্তাটা দেখিয়ে। গাড়ির ভিতরে মেয়েদের মুখগুলি দেখছিল আশা। ফাঁপা ফাঁপা চুল, মুখে মোটা করে পাউডার মাখা। ঠোঁটে রং। বড় গাড়িটার তিনটি মেয়ের মধ্যে দুজনেরই চোখে কালো চশমা। আর একজনের চোখে কাজল। ওরা মেয়ে পুরুষ সবাই যেন কী এক উৎসবে মেতে উঠেছে। হাসছে বক্ বক্ করছে, এ ওর গায়ে পড়ছে। ওদের যে এত লোক দেখছে সেটা যেন খেয়ালই নেই। আশার মনে হল ওরা যেন অন্য গ্রহের মানুষ। ওরা তো সেই ছবি। ওরা সেই ছায়া, যারা সেই অন্ধকার ঘরটার পর্দায় ভেসে ওঠে। হাসে কাঁদে গায়। ভালবাসে হিংসা করে। লুকিয়ে মন্দিরের পিছনেও ওরা যায়, মায়ের বকুনি খায়, বাবাকে ভয় পায়, প্রতিবেশীর চোখ ঠারাঠারি, হাসাহাসি, খারাপ কথা সবই শোনে। আশাদের মতই। তবু আশাদের মত নয়। এই মাটি, এই গাছ, এই আকাশ, আমাদেব এমন রক্ত মাংস মন.

অমন সত্যিকারের মা আর কাপড়ের কলের কেরাণীর ছেলেমেয়ে কিংবা লোহা কারখানার হাজিরাবাবুর মত ওরা নয়। ওরা ছায়া, ছবি হয়ে শুধু আমাদের হেসে কেঁদে দেখা দেয়। তখনো ওরা আমাদের দেখতে পায় না। এখনো তেমনি দেখতে পাচ্ছে না। ওরা যে কোথায় থাকে, কে জানে! কেমন ভাবে থাকে? কেমন বিচিত্র আর রহস্যময় মনে হয়। ওই তো, ওদের বেশভূষা কথাবার্তা, হাসি, চাউনি, সব যেন আশার অন্যরকম লাগছে। ওরা যে-ছায়ালোক থেকে এসেছে, সেখানকার পরিবেশটুকুও যেন নিয়ে এসেছে সঙ্গে করে। পুরুষেরা সকলেই সেরকম নয়। এ শহরের সেই ছেলেদের মত, যাদের কোমরের নীচে প্যাণ্ট, অদ্ভুত জামা আর কপালের কাছে চুড়ো করা চুল। এমনি সাধারণ মানুষের মতও অনেকে আছে। তবু তারাও যে সেই দূর ছায়ালোকের মানুষ, তা বোঝা যাচ্ছে হাসিতে কথাবার্তায়। সবাই যেন স্বপ্নের ঘোরে রয়েছে। মেয়েরা যে-কোনো ছেলের সঙ্গে কথা বলছে, হাসছে, হাত ধরছে। ছেলেরাও তেমনি করছে। সমাজ-সামাজিকতা ঘর-সংসারের কোনো ভয় নেই যেন ওদের। সে-সবের ঊর্ধ্বে ওরা।

আর লোক আসছে অনবরত। ঝড়ের বেগে সংবাদ রটেছে। জোয়ারের বেগে আসছে গোটা শহর ভেঙে। আজ যেন এখানে মেলা লেগেছে। গাড়িগুলি ঘিরেছে সবাই। কে কত কাছে যেতে পারে গাড়িগুলির, তার জন্যে ঠেলাঠেলি করছে।

প্রথম গাড়িটার পরে, সবুজ রং-এর গাড়িটার চারপাশেও ভিড় জমেছে খুব। অস্পষ্ট হলেও আশা দেখতে পাচ্ছে, সবুজ গাড়িটায় মাথায় সিল্ক্-স্কার্ফ বাঁধা একটি মেয়ে রয়েছে। তার ফর্সা গাল, রং মাখা ঠোঁট আর কালো চশমার অংশও দেখা যাচ্ছে।

আশার ভয় হল, গাড়ির মানুষগুলির কারুর সঙ্গে যদি ওর চোখা-চোখি হয়। তা হলে ওরা নিশ্চয় সব হেসে উঠবে। লজ্জায় মরে যাবে সে। কিন্তু কী ভাগ্যি, ওরা দেখতে পায় না।

আশা দেখলো, পাড়ার মেয়ে বউ সবাই এসে ভিড়েছে দূরে দূরে। যে-ছেলেরা সারাদিন এখানে ওখানে জটলা করে, তারা তো এসেছেই। বুড়োরাও এসেছেন। আশা আরো অবাক হয়ে দেখলো, ফটিকদাও এসেছে কার্তিককে সঙ্গে নিয়ে। আশার দিকে তাদের নজর নেই। হাসি পাচ্ছে আশার ফটিককে দেখে। কেমন হতভম্ব বিস্ময়ে ফটিকদা মানুষগুলিকে দেখছে। যেন, একেবারে ছেলেমানুষ। কার্তিক ঘাড়ে হাত দিয়ে কী যেন বললো। কিন্তু ফটিকদার খেয়াল নেই। অন্যমনস্ক বিরক্তিতে হাতটা সরিয়ে দিল কাঁধ থেকে। একেবারে বিভোর।

তারপরে আশার চোখ পড়লো তার ভাই শ্যাম আর রামের দিকে। কী পাজী দেখ! বই খাতা বগলে হা করে দাঁড়িয়ে আছে। স্কুলে যায়নি এখনো।

কিন্তু ওরা সবাই গাড়ির গায়ের কাছে। অত কাছে যেতে সাহস হল না আশার। এমন সময় সেই কালো চশমা চোখে ভদ্রলোক হাত তুলে পিছনের গাড়িগুলিকে ইশারা করলেন। তারপরে গাড়ির ভিতরে চলে গেলেন। সেইসঙ্গে বিনোদ ভট্চার্যের ছেলে, হরিশও। গাড়িগুলি তার পর চলতে আরম্ভ করলো বনশিউলীর ঝাড়ে ঝাপ্টা খেতে খেতে। রাস্তাটায় এত ধুলো ছিল, কেনোদিন টের পাওয়া যায়নি।

কে একজন চেঁচিয়ে বললো, বিনোদ ভট্চার্যের বাড়ির সামনের মাঠটায় গাড়ি দাঁড়াবে।

আশা বুঝলো, সেই বাড়িটাতেই ওরা থাকবে। এখানে তা হলে সিনেমা তুলবে। আরো কয়েকবার এই শহরে সিনেমার লোকেরা এসেছে। কিন্তু এ পাড়ায় কখনো আসেনি। আর বাড়ি ভাড়া করে থাকবার কথা শোনেনি কখনো।

কিন্তু ফটিকদা কার্তিক শ্যাম রাম, সবাই ভিড়ের সঙ্গে গাড়ির পিছু ছুটে গেল। আশারও যেতে ইচ্ছে করলো। সাহস হল না। কারণ মেয়েরা কেউই প্রায় যাচ্ছে না। শুধু দু' চোখে অসহ্য কৌতূহল

নিয়ে, ধুলো ঢাকা বনশিউলীর জঙ্গল আর অপসৃয়মান ভিড়ের দিকে তাকিয়ে রইলো।

তারপরে মায়ের কথা মনে হতেই পিছন ফিরে দেখলো পদ্মকে।

আশা বললো, কোথায় সিনেমা তুলবে রে?

পদ্ম বললো, নদীর ধারে নাকি তুলবে! কিন্তু আজ নয়, কাল সকালে। একমাস থাকবে এখানে।

—এক মাস? রোজ তুলবে?

—হ্যাঁ।

আশার বিস্মিত কৌতূহলিত চোখ দুটি খুশিতে ঝল্‌কে উঠলো। বললো, মা'কে বলে আসি!

বলে সে তার আধ খোলা বেণী দুলিয়ে ছোট মেয়েটির মত দৌড় দিল। বাড়িতে এসে দেখলো, মা সেলাই নিয়ে বসেছে। আশা ডাক দিতেই শান্তি বললো, শুনেছি। সিনেমা তুলতে এসেছে।

আশা হাঁপাতে হাঁপাতে বললো, এক মাস ধরে তুলবে।

সেলাইয়ের দিকে নজর রেখে শান্তি বললো, তা বলে রোজ রোজ ওখানে নেচে নেচে যাওয়া চলবে না বলে রাখলাম।

আহা! মার যেমন কথা! ভুরু কোঁচকাতে গিয়ে হাসি পেল আশার। মা ঠিক ভাবছে, ফটিকদার সঙ্গে মেশামিশির বেশী সুযোগ পাবে বলে আশা খুশী হয়েছে। তার মনে পড়লো, শ্যাম আর রামের কথা। কিন্তু সে বললো না। তা হলে মা রেগে উঠবে। ঠিক বলবে, আপদ এসে জুটেছে, ছেলেগুলোর ইস্কুল করা মাথায় উঠবে এবার।

আবার বেণীতে হাত দিল আশা। আর তার বিশাল কালো দিঘী-চোখের কূলে কূলে ঠোঁটের কোণে একটি বিচিত্র হাসি দেখা দিল। ভাবলো, এই জন্যেই বোধহয় আমি সেদিন অমন চমকে উঠেছিলাম মোটরগাড়ির শব্দ শুনে। আজ শহরসুদ্ধ সবাই চমকে উঠেছে।

ভাবতে ভাবতেই ঠোঁটের ওপর হাত চাপা দিল আশা। আর একটু হলেই শব্দ করে হেসে ফেলতো। অমনি মায়ের রুষ্ট সন্দিগ্ধ ...ব চোখ কুচি কুচি করে কাটতো তাকে ; কী যে বিশ্রী হাসি পায় ! ...মন নিজের ওপর বিরক্ত হতে গিয়েই আশার নজরে পড়ে মস্ত বড় প্রজাপতিটাকে। মস্ত বড় প্রজাপতিটা পাখায় বাজ্যের রং মেখে আশার মনের সঙ্গে মিতালী করে হাসছে। কখনো তার রুক্ষ ...াথায়, কখনো তার বাসী কাপড়ের আঁচলে বসতে আসছে। আবার ...ড়ছে। আশা ঠোঁট টিপে ভুরু কুঁচকে হাত বাড়ালো। রঙিন ...তঙ্গটা বাতাসের আগে উড়ে চলে গেল দিন মলিনা কৃষ্ণকলির ...াড়ে।

তারপরে আশা বাইরের দিকে তাকিয়ে ভাবলো, আজ আর ...টকদা সতীতলার মন্দিরের পিছনে আসবে না। হা করে ফিল্‌মের ...াক দেখতে দেখতেই কারখানার সময় হয়ে যাবে। আর যদি ...খা হয় তা হলে আশা বলবে, গাড়ির শব্দটা শুনে পরশু বোধহয় এ ...ন্যই চমকে ছিলাম।

কিন্তু আরো চমক বাকী ছিল আশার। সেটা বোঝা গেল ...র পরদিন সকালবেলা। পরদিন সকালবেলা রাজ্যের লোক ...সেছে নদীর ধারে। পাড়া থেকে খানিকটা দূরে, সেই নাগ্‌রা ...টে, যেখানে ঘাট নেই, খেয়া পারাপার নেই, উঁচু পাড়ে শুধু বাগান ...ার জঙ্গল। ফিল্‌মের লোকেরা গেছে সেখানে। চারটে গাড়িই ...খানে এসেছে. নাগরাঘাটে মেয়ে-পুরুষ সবাই এসেছে। সাউণ্ডভ্যান ...কে সাপের মত কালো রবারের তার এঁকেবেঁকে নেমে গেছে নদীর ...রে। ট্রলিসহ ক্যামেরা কালো কাপড়ে ঢাকা একটি অদ্ভুত ...পটিমারা জানোয়ারের মত দেখাচ্ছে। ছোট একটি তাঁবু খাটানো ...য় গেছে এর মধ্যেই। ছোট ছোট বেতের মোড়া এসে গেছে ...নেকগুলি। ওরা সবাই ব্যস্ত। শুধু কয়েকজন মেয়ে-পুরুষ

ছাড়া। সে-সব মেয়ে পুরুষদের চেহারার মধ্যে কী যেন আছে। যদিও এমনিতে কিছুই মনে হয় না। শুধু তাদের রং মাখা ছাড়া। অন্তত আশার তাই মনে হয়।

আশাও এসেছে দেখতে। আর আজও তার তাই মনে হচ্ছে ওদের দেখে। ওরা কিছু দেখছে পাচ্ছে না। ওরা, ওই চারজন মেয়ে আর কয়েকজন পুরুষ, যাদের অধিকাংশেরই চোখে গগল্‌স। ওরা কেউ গাছতলায় কেউ তাঁবুর সামনে এলিয়ে বসে আছে। হাসছে কথা বলছে তবু যেন ওদের ঘিরে এক নাম না জানা দূর রহস্যের ছায়া। সবাই ওদেরই দেখছে। সবচেয়ে বেশী ব্যস্ত সেই কালো ফ্রেমের চশমা পরা ভদ্রলোক। তিনি সবাইকে নির্দেশ দিচ্ছেন, কী সব বোঝাচ্ছেন। মাঝে মাঝে দেখছেন ফাইল খুলে।

তারপরে হঠাৎ ভদ্রলোক ভিড়ের দিকে ফিরে তাকালেন। যে-ভিড়টাকে একটি মোটা দড়ির সীমানার বাইরে রাখা হয়েছে। ভদ্রলোককে সবাই কানুদা বলে ডাকছে।

পদ্ম বলল, এই রে, এবার বোধহয় ভাগিয়ে দেবে সবাইকে।

আশা বলল, কেন?

—দেখছিস না, ওই লোকটা বার বার তাকাচ্ছে। ও তো ডিরেক্টার।

—ওই যাকে সবাই কানুদা বলছে?

—হ্যাঁ।

পাশ থেকে ফটিক বলে উঠল, ভাগালেই হল আর কি। ওদের কেনা জায়গা নাকি?

আশা চমকে পিছন ফিরলো। ফটিক তার উপস্থিতি ঘোষণা করবার জন্যেই কথাটা বলেছিল। চোখাচোখি হতেই আশার হাসিটা লজ্জায় বিব্রত হয়ে উঠলো। পদ্ম ছাড়াও আরো বন্ধুরা রয়েছে। গীতা বাণী সুষমারা রয়েছে আশেপাশে।

পদ্ম লুকিয়ে চিমটি কাটলো আশাকে। ফটিকের দিকে ফিরে বললো, কারখানায় যাননি ফটিকদা?

বাণীর গলায় শোনা গেল মেয়েদের দল থেকে, আজ এ কারখানার হাজিরা নেবে ফটিকদা।

ফটিক বিনা বাক্যে আশার পাশে এসে দাঁড়ালো। আশা সভয়ে চারপাশে তাকিয়ে, সন্ত্রস্ত গলায় বললো, ও কি করছ ফটিকদা, ওই দেখ শান্ত-পিসি এইদিকে তাকিয়ে আছে।

ফটিক ঠোঁট বাঁকিয়ে বললো, থাকতে দে। ওরা চিরকালই ওরকম তাকিয়ে থাকবে। তোর পাশে দাঁড়ালে যদি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায় তো যাক্।

কথাটা নিশ্চয় ন্যাড়া মাথা বিধবা, থপথপে মোটা, পাড়ার শান্ত-পিসির কানে যায়নি। গেলে, শান্ত-পিসি চুপ করে থাকত না।

সন্ত্রস্ত লজ্জার মধ্যেও ভরা কলসীর উপছানো জলের মত খুশী চলকে পড়ছিল আশার চোখে মুখে। যদিও তার হাতে মায়ের দেওয়া সুতো কেনবার পয়সা ঘামছে। সে বললো, কাজে যাবে না আজ?

ফটিক বললো, দু'ঘণ্টার বাড়তি ছুটি নিয়ে এসেছি। ওদিকে দেখেছিস, তোদের পাড়ার বিভা সুন্দরীকে। হিরোইনের মত সেজে কেমন দড়ির ওপর ঝুঁকে দাঁড়িয়েছে। আশা দেখলো বিভাকে। ড্রেস দিয়ে বোম্বাই সিল্কের শাড়ি পরে চুলের গোছায় হর্সটেল্ করে এসেছে। বিভার সঙ্গে আশার কথা নেই অনেকদিন। বিভা এক বছর কলেজে পড়েছিল। এখন প্রায়ই সেজেগুজে কলকাতায় যায়। কোথায় যায়, কেউ জানে না। এক সময়ে নাকি ফটিকের সঙ্গে ওর খুব ভাব ছিল। এখন আর নেই। কেন, তা কে জানে। লোকে যা-ই ভাবুক বিভার ধারণা ও বিশ্বাস, আশার জন্যেই ফটিক ওর কাছ থেকে সরে পড়েছে। তাতেও কথা বন্ধ হবার কারণ ছিল না। বিভা একদিন আশার সামনে ফটিকের নামে মাতাল, বদমাইস, বলে গালি দিয়েছিল।

আশা বললো, আমাদের পাড়ার কেন। তোমারই হিরোইন।

ফটিক বললো, আমার চৌদ্দ পুরুষের হিরোইন।

এমন সময়ে সেই কালো ফ্রেমের চশমা চোখে ভদ্রলোক, কানুদা সদলবলে ভিড়ের দিকে এগিয়ে এলেন। হাত জোড় করে বললেন, আপনারা দেখুন তাতে আপত্তি নেই, কিন্তু একেবারে চুপচাপ না থাকলে কাজ করা যাবে না।

ফটিক বলে উঠলো, ঠিক আছে, আপনি আরম্ভ করে দিন দাদা, আমরা আছি, কিছু ভাবতে হবে না আপনাদের।

আশার লজ্জা করলো ফটিকের এইরকম গায়ে পড়া কথা শুনে। কিন্তু ফটিকদা এরকমই। সঙ্গে সঙ্গে সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে লেগে গেল গোলমাল থামাতে। ফল পাওয়া গেল ঠিকই। গোলমাল থেমে এল অনেকখানি।

কানুদা ভিড়ের দিকে তাকিয়ে কী যেন বললেন পাশের ছেলেটিকে। যার গায়ে ম্যারিনশার্ট, গলায় ক্যামেরা, ঠোঁটে সিগারেট। আবার কী যেন বললেন বিনোদ ভট্চাযের ছেলে হরিশকে।

হরিশ সঙ্গে সঙ্গে আঙুল দিয়ে, সামনেই বিভাকে দেখিয়ে দিল। কানুদা ঘাড় নাড়লেন। শোনা গেল, বললেন, না, হবে না।

বলে নিজেই ভিড়ের মধ্যে ঢুকে, যেন কাউকে খুঁজতে লাগলেন।

হরিশ বলল, এখান থেকেই নেবেন? পরে হলে হবে না।

—দেখি না, পাওয়া যায় কি না কাউকে।

মেয়েরা সবাই যেন কেমন সঙ্কুচিত হয়ে উঠলো। ভদ্রলোক মেয়েদের দিকেই বারবার তাকাচ্ছিলেন। লক্ষ্য করে দেখছিলেন সবাইকে। তারপরে আশার সামনে এসে থমকে দাঁড়ালেন। বললেন, একে চেনেন হরিশবাবু?

হরিশ আশাকে দেখে অবাক হয়ে বললো, চিনি বৈ কি। আমাদের পাড়ারই মেয়ে তো।

আশা যেন চমকে ভয় পেয়ে, এক পা পেছিয়ে দাঁড়ালো। সবাই

তখন তার দিকে তাকিয়ে আছে। শুধু ফটিক গেছে গোলমাল থামাতে। আশার বুকের মধ্যে গুর্ গুর্ করে উঠল।

কানুদা বললেন হরিশকে, একবার কথা বলে দেখুন না। যদি আপত্তি না থাকে, অবশ্য এর গার্জেনের মতামতও চাই।

হরিশ অবাক হয়ে, আশার প্রায় প্রত্যহ দেখা সাধারণ মুখটি একবার দেখলো। বললো, আশা, ফিল্মে নামবে? একটা ছোট রোলের জন্য মেয়ে দরকার। এখানকারই কাউকে চান ওঁরা।

দিঘীর বুকে প্রথম সূর্যের রক্তচ্ছটা দেখা দিল আশার চোখে। মনে হল, কোনো এক অদৃশ্য বায়ু ওকে ঝাপ্‌টা মেরে গেল। সলজ্জ হাসিটা ঠিক হাসি নয়, যেন গলা টিপে ধরলো ওর। খুশীতে উপচে পড়া নয়, একটি ভীরু রহস্যময় হাতছানি ওকে যেন ডাক দিল সেই দূর ছায়ালোক থেকে। সাধ করে নয়, ছায়াচারিণী হবার এক অসাধ্য সাধনের মাধ্যাকর্ষণ ওকে টেনে নিয়ে গেল। ফটিকদাকে দেখবার জন্য একবার এদিক ওদিক তাকিয়ে, ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়ে দিল। তারপরে, প্রায় চুপি চুপি রুদ্ধশ্বাস গলায় বললো' বাবাকে বলতে হবে।

হরিশ বললো, হরেনবাবুকে তো। উনি তো এখন বাড়ি নেই নিশ্চয়?

আশা বললো, না। সন্ধ্যাবেলায় থাকবেন।

—ঠিক আছে আমি গিয়ে বলব তখন।

কানুদা বললেন, আমিও যাব তোমার বাবার কাছে।

আশা আবার এদিক ওদিকে দেখলো ফটিকদার জন্য। তারপরে বললো, আমি পারব?

কানুদা বললেন, সে ভার আমি নিচ্ছি খুকী, তোমাকে ভাবতে হবে না।

আবার সেই খুকী। সেই প্রথমদিনের মত। এই জন্যেই কি আশা চমকেছিল সেদিন?

ক্যামেরা গলায় ছেলেটি, কানুবাবুর অ্যাসিস্টাণ্ট, বললো, আসুন আপনি আমাদের তাঁবুর ওখানে।

কী করবে আশা? সে এদিক ওদিক তাকালো আবার। পদ্ম তার গায়ে ধাক্কা দিয়ে বললো, যা না, যা।

পদ্ম খুশী হয়েছে। বীণা সুষমারা চুপ করে আছে। যেন কী এক অপরাধ করছে আশা। শান্ত-পিসির চোখ জোড়া যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। পাড়ার চেনাশোনা ছেলেদের চোখগুলি বাঁকা ছোরার মত তীক্ষ্ণ খোঁচা হয়ে আছে। বিভা চলে যাচ্ছে নদীর উঁচু পাড়ের দিকে উঠে।

আশা বললো, এখুনি যেতে হবে?

কানুবাবু বললেন, না। তুমি কাল-পরশু থেকে কাজ করবে। এখন সকলের সঙ্গে গিয়ে আলাপ করে নাও। চল, একে নিয়ে চল বিনয়। হ্যাঁ, কী নাম তোমার।

—আশা। আশালতা চক্রবর্তী।

—বেশ।

গলায় ক্যামেরা ঝোলানো বিনয় বললো, এসো।

সজ্ঞানে নয়, একটি অজ্ঞান ইশারায় যেন আশা চলে গেল। চলে গেল দড়ির বেড়া পেরিয়ে, ছায়াদের সীমানায়। তবুও এখনো ও রক্তমাংসের মানুষের মত সবই দেখতে পাচ্ছে। তাই আর একবার পিছন ফিরলো। দেখলো, ফটিকদা ছুটে এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো বেড়ার ওপারে, যেন শিশুর-বিস্ময় নিয়ে হতবাক হয়ে তাকিয়ে আছে।

বুকটা কেমন করে উঠলো আশার। ও আবার দড়ির বেড়ার দিকে ফিরতে গেল। ডাকলো, ফটিকদা।

ফটিক হাত তুলে বললো, ওখান থেকে ঘুরে আয়, তারপর কথা হবে।

আশা ফিরলো, কিন্তু বুকের মধ্যে কেমন একটা আড়ষ্টতা ঠেকে রইলো। বিনয় বললো, এক মিনিট।

তারপরেই ক্লিক্ করল ক্যামেরা। আশা হাসলো। আবার ক্লিক্ করলো ক্যামেরা। আশা অবাক হয়ে বললো, কি করছেন?

জবাবে ক্যামেরাটা আর একবার ক্লিক্ করলো। হেসে বললো বিনয়, তোমার স্টীল নিলাম।

—স্টীল মানে?

—ফটো। চলতো ওই জলের দিকে, আর একটা নিয়ে নিই।

সহজেই বিনয় তুমি বললো। যেন কতদিনের চেনা। এরা সবাই আশাকে বুঝি খুব ছেলেমানুষ ভেবেছে? আশা হেসে নদীর দিকে গেল। ফটো নিল বিনয়। তারপর তাকে নিয়ে এল তাঁবুর কাছে।

এবার ছায়ারা নড়লো, যদিও আলস্যে জড়িয়ে। চোখ তুলে তাকালো আশার দিকে। দেখতে পেল এবার, বোধহয় আশাও এখন ছায়া হয়ে গেছে, কিংবা হয়ে যাবে তাই।

বিনয় একজনকে দেখিয়ে বললো, ইনি চঞ্চলাদি, আমাদের হিরোইন।

স্কুলের ইন্‌ফ্যাণ্ট ক্লাসের ছেলেও নামটা জানে এদেশে। সেই চঞ্চলার সামনে হঠাৎ শীত-ধরা বাতাসে কেবল কুঁকড়ে উঠলো আশা। লজ্জা ও উত্তেজনায় করুণ হয়ে উঠলো ও।

বিনয় বলেই চলেছে, ইনি আমাদের কনকদি, সরমা চ্যাটার্জি, অনসূয়া মজুমদার। আর এই হল বিজনদা হিরো, প্রাণেশদা, সুলতান···।

চঞ্চলা বলে উঠলো, তা হলে লোকেশন থেকেই নেওয়া হল?

বিজন বললো, কানুদা ক্রমেই বেশী রিয়ালিস্টিক হয়ে উঠছে। এস, ভাই, বস, তোমার নাম কী?

আশাকেই আসতে বলছে, তারই নাম জিজ্ঞেস করছে। যেন পর্দার বুকেই সহজ ভঙ্গীতে কথা বলছে ছায়ারা। কিন্তু মানুষিক আড়ষ্টতা কঠিন হাতে এখনো অসহজ করে রেখেছে আশাকে।

অগ্রহায়ণের এ শীত-শীত সকালে ও ঘেমে উঠলো। বললো, আশালতা।

—চমৎকার নাম। কোন্ রোল্‌টার জন্যে একে নিয়েছে?

বিনয় বললো, সেই হিরোইনের বালিকা প্রতিবেশিনী।

একটু বয়োজ্যেষ্ঠ প্রাণেশ বললো, চমৎকার মানাবে।

আশা বিনয়ের দিকে ফিরে বললো, আমি এবার বাড়ি যাব?

—এখুনি? আচ্ছা দাঁড়াও। কানুদা, শুনুন আশা বাড়ি যেতে চায়।

কানুদা কাছে এল। বললেন, আচ্ছা যাও এখন, সন্ধ্যাবেলা তোমাদের বাড়ি যাব আমি হরিশবাবুকে নিয়ে। তুমি আজ শুটিং দেখবে না?

আশার দৃষ্টি নেমে গেছে। কথা বলতে ঠোঁট শিথিল মনে হচ্ছে। বললো, দুপুরে আসব।

বলে ও ফিরলো ভিড়ের দিকে। দড়ির সীমানার ওপারে,যেখান থেকে ও এসেছিল। যদিও মাত্র দশ পনর মিনিটের মধ্যে, সে জায়গাটা যেন তার চরিত্র বদলে ফেলেছে। কিংবা আশা নিজেই বদল হয়ে এসেছে ওই ছবিদের সীমানা থেকে। তাই ওর চোখে সব অন্যরকম ঠেকছে। মুহূর্তে চমক ও বিস্ময়ের ঝলক যেন একটি শূন্যতা এনে দিয়েছে মনের মধ্যে। কী ঘটেছে, সবটা যেন এখনো হৃদয়ঙ্গম করে উঠতে পারেনি।

দেখলো, সবাই যেন ওর দিকে কেমন করে তাকিয়ে আছে। চেনা অচেনা, সবাই। আশার লজ্জা হল, ভালও লাগলো। তবু ভয় হল, কষ্ট হল। ভিতরে ভিতরে যতই একটি হাসি উত্তাল হয়ে উঠলো, অতল গভীরে ততই যেন একটি কান্নার ঘূর্ণী আবর্তিত হয়ে উটতে লাগলো। কেন? এ আবার কি?

আশা দেখলো পদ্ম হাত বাড়িয়ে ছুটে এল না। কোন ব্যগ্র কৌতূহলী জিজ্ঞাসা নেই ওদের। ওরা, পদ্ম বাণী সুষমা, সবাই হাত ধরাধরি করে দাঁড়িয়ে হাসছে আশার দিকে চেয়ে। সবাই ওকে পথ করে দিল ভিড়ের মধ্যে।

বড় যেন বাতাশ লেগেছে আশার দিঘী-কালো চোখে। আলো-কালোর দ্রুত ঝড় ওর চোখে। জিজ্ঞেস করলো, পদ্ম, ফটিকদা কোথায় গেল ?

পদ্ম বলল, কি জানি। মনে হল, ওপরের দিকে উঠে গেল।

চলে গেছে ? দু'ঘণ্টার ছুটি নিয়ে না এসেছিল ? বলেছিল যে, ফিরে এলে কথা হবে। একটা তীক্ষ্ণ কাঁটা, কোথায় খোঁচা দিয়ে যেন চমকে দিতে লাগলো আশাকে। ও উঁচু পাহাড়ের দিকে পা বাড়ালো।

পদ্ম জিজ্ঞেস করলো, চলে যাচ্ছিস যে ? ওখানে যাবি নে।

অর্থাৎ দড়ির বেড়ার ওপরে। আশা বললো, পরে যাব।

ওকে তখন সতীতলার মন্দিরের পিছনটা ডাক দিয়েছে। কিন্তু সেখানে কেউ নেই। শুধ্ পাখিরাই ব্যস্ত হল। ব্যস্ত মেয়েটিকে দেখে উড়ে পালালো। মা'কে বুঝি তাড়াতাড়ি খবর দিতে গেছে ফটিকদা ? কিন্তু পয়সাগুলি ততক্ষণে চটচটিয়ে উঠেছে হাতের ঘামে। বিশুকাকার দোকানে যেতে হবে একবার সেলাইয়ের সুতো কিনতে।

দোকানের দিকে পা বাড়ালো আশা। তবু বিস্ময়ে, অজানা এক খুশী ও ভয়ে যেন ওর পা জোড়া আড়ষ্ট, বিপথগামিনী। ছায়ারা ওকে ডাক দিয়েছে। সেই বিচিত্র ছায়া-লোকে যাবে ও।

পিছন থেকে শ্যামের চিৎকার শোনা গেল, দিদি, এই দিদি।

দেখলো, শ্যাম আর রাম, দু'জনেই ছুটতে ছুটতে আসছে। বগলে ওদের বই। আজও স্কুলে যায়নি।

হাঁপাতে হাঁপাতে চোখ বড় করে বললো শ্যাম, দিদি, তুই নাকি সিনেমায় নামবি ?

রাম একেবারে আঁচলে হ্যাঁচকা মেরে জিজ্ঞেস করলো, সত্যি নাকি রে ?

আশা বললো, কে বললে ?

শ্যাম বলল, ওখানে সবাই বলছে।

শ্যাম রাম দু'জনেই কয়েকটা পাক খেয়ে নিল। রাম টানাটানি করতে করতে আশার আঁচলটাই খুলে ফেললো গা থেকে।

আশা তাড়াতাড়ি আঁচল টেনে বললো, এই অসভ্য, কাপড় ছাড়।

তারপরেই শ্যাম বললো, দেখিস্ দিদি, বাবা তোকে নামতে দেবে না।

রাম সঙ্গে সঙ্গেই বললো, আর মা তোকে চুলের ঝুঁটি ধরে টেনে দেবে।

আশা ভেংচে বললো, তোদের বলেছে। তোরা স্কুলে যাবি নে?

শ্যাম বললো, না। মাকে বলতে যাচ্ছি তোর কথা।

বলেই দু'জনে ছুটলো বাড়ির দিকে। মায়ের মুখখানি মনে পড়লো আশার। একটু যেন থম্‌কে গেল সে। পরমুহূর্তেই হাসলো আবার। সাইকেলের ক্রীং ক্রীং শব্দে চমকে তাকালো সামনে। কিন্তু সে অন্য লোক, অন্য সাইকেল।

তাড়াতাড়ি সুতো নিয়ে বাড়ি এল আশা। চুলের ঝুঁটি ধরে নাড়া না দিক, তার চেয়ে বড় রকমের নাড়া খাবার ভয় রয়েছে আশার। তাই, চুপি চুপি বাড়ি ঢুকলো আশা। কিন্তু শান্তি কিছুই বললো না। বাবার মাসিক সাতাশী টাকার আয়ের ওপরে মা তার বাড়তি আয়ের ঠোঙা তৈরী করছিল বসে বসে। শুধু ঠোঙা নয়, পাড়া প্রতিবেশীর ছোটখাটো হাতে-সেলাইয়ের কাজও মায়ে ঝিয়ের ভাগা-ভাগিতে আছে।

মা একবার তাকিয়ে দেখলো আশাকে। শ্যাম রাম, কেউ নেই। বোধহয় মা বকে ধমকে স্কুলে পাঠিয়ে দিয়েছে।

আশা বললো, মা সুতো এনেছি।

মা বললো, ঘরে রাখ্।

ঘরে ঢুকে আশা চুপ করে দাঁড়িয়ে পড়লো। কী জানি, মা কি

ছেলেবেলার মত ঘরে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে মারবে নাকি? শুনেছে তো নিশ্চয়। বেহায়া নির্লজ্জ বলে একটু বকুক না মা।

ভাবতে ভাবতেই আশা মায়ের গলা শুনতে পেল, ওরা নিজেরাই তোকে ডেকে নিলে?

আশা তাড়াতাড়ি বললো, হ্যাঁ।

—টাকা দেবে?

চমকে গেল আশা। মা রাগ করেনি? শাসন করবে না? অবাক হয়ে ভাবলো, টাকার কথা তো জিজ্ঞেস করেনি। তবু বলে ফেললো, তা তো দেবেই, যদি করি। সেসব কথা বাবাকে বলতে আসবে আজ সন্ধ্যেবেলা।

তারপরে চুপচাপ। মা আর কিছুই বললো না। রাজী না অরাজী, বোঝা গেল না কিছুই। যেন খানিকটা সন্ধ্যাবেলা বাবার ইচ্ছে অনিচ্ছের ওপরে ঠেলে রেখে দিল ব্যাপারটা। কিন্তু মা বকলো না। রাগ দেখালো না।

আশা পা টিপে টিপে ওদের সেকেলে ভাঙা বড় আয়নাটার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। নিজের ছায়ার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে হেসে ফেললো ও। সেই রহস্যময়ী ছায়ালোকে সত্যি যাবে ও? আশ্চর্য। কেন? নিজেকে দেখলো আশা। সেই তো ডুরে শাড়ির ঘেরাওয়ে, ছিটের জামার বেষ্টনীতে সেই একই রকম দেখাচ্ছে তাকে। তবু যেন অবাক হয়ে, নিজের প্রতিটি অঙ্গে অনুসন্ধিৎসু হয়ে তাকালো। ওই ছায়াদের মত শরীরের ভাজে ভাজে তেমন উঁচুনিচুর রুদ্ধশ্বাস ঢেউ কোথায় আশার অঙ্গে অঙ্গে? এ যেন কিছু নম্র, একটু বা বিষণ্ণ তবু ওর নিজের উচ্ছল চাপা হাসির মতই এক গোপন উচ্ছ্বাসে সারা শরীরটাকে বড় স্তরাসে ঢাকা ঢাকা রাখতে ইচ্ছে করে। পুরুষের চোখের কাছে যে এতেই নিজেকে পরিস্ফুট মনে হয়। ফটিকদার কাছে এই যে দুরন্ত উচ্ছ্বাস আকুল হয়ে ওঠে।

কিন্তু ওদের? চোখ তোলবার আগে সবটুকু চোখে পড়ে। তবু

সে যেন একটা সর্বনাশের মত ভাল লাগে। তাই নিজেকে সাজিয়ে দেখতে ইচ্ছে করলো আশার। আয়নাটার দিকে তাকিয়ে দেখলো আশা, ওর দু'পাশে চুল ফাঁপানো, মুখে আর ঠোঁটে রং, চোখে কাজল, ভুরুতে কালো আঁচড়। পেটকাটা ছোট পাতলা জামা, ভিতরে ব্রেসিয়ার, আর তারই উজান টানে দুই শিখর—মধ্যে নীল সিল্ক, বহতা নদীর মত। সবশেষে ও চোখে দেখলো কালো গগলস্। আর সঙ্গে সঙ্গে একটা দমকা হাসি ওর বুক ঠেলে উঠে এল। আঁচল দিয়ে মুখ চেপে ধরলো সেই মুহূর্তেই। সর্বনাশ! মা রয়েছে। কী একটা ভেবে বসত এখুনি হঠাৎ হাসি শুনলে।

কিন্তু ফটিকদা কেন না জানিয়ে চলে গেল? তাড়াতাড়ি বিনুনী খুলতে লেগে গেল আশা। খুলতে খুলতে গেল রাংচিতের বেড়ার কাছে। ভাবলো, ফটিকদা নিশ্চয় ওখানেই রয়েছে। যা আত্মভোলা বিভোর মানুষ কোথায় বসে হয়তো হা করে সিনেমা তোলা দেখছে। আশার দিকে নজরও ছিল না হয়তো। এখন বুঝি হা করে দেখছে।

মন খারাপ হয় বৈ কি একটু। অতটা আত্মভোলা হলে মেয়েদের মনে লাগে! ফটিকদার মনেও কি লাগে না? লাগে, অনেকবার তা টের পেয়েছে আশা।

দু'তিনটে প্রজাপতি মাথার কাছে মুখের কাছে পাখা ঝাপ্টা দিয়ে গেল। আশা ভুরু কুঁচকে দেখলো, কিন্তু মন দিল না। বিনুনী খুলে মাথায় তেল দিয়ে তাড়াতাড়ি মাকে বলে, নদীতে ছুটলো।

মা ছুঁড়ে দিল পিছন থেকে, এখন যেন আবার ওখানে রঙ্গ করতে যেও না, সংসারের কাজ আছে।

অর্থাৎ সিনেমার ওখানে যেন এখন না যায়। জবাব না দিয়ে আশা ছুটলো। কিন্তু সতীতলার মন্দিরে সেই পাখিদের নির্ভীক জটলা। ঝুরি-নামা বটের ছায়ায় রোদের লুকোচুরি খেলা। বিগ্রহহীন পুরনো মন্দিরটা তেমনি শেষের দিনের নোটিশ-পাওয়া বিমূঢ় স্তব্ধতায় শিরদাঁড়া বাঁকা।...

সহসা উদাস হল আশার মন, সব তরঙ্গ থির নিস্তরঙ্গ হল। আর অনেক তলায়, ছোট একটা ঘুর্ণী পাক খেয়ে উঠলো অভিমানে। তবু চোখের পাতা নামিয়ে, ভুরু কুঁচকে একটি জিজ্ঞাসা বাঁকা বড়শির মত বিঁধে রইলো। কোথায় গেল ফটিকদা?

ঘাটে গেল আশা। জলের নীচে শ্যাওলার আলুলায়িত জটা বাঁচিয়ে চান করলো। আজ ঘাটে ভিড় কম। দুটি ডুব দিয়ে উঠে পড়লো আশা। ওপরের ধানকাটা-মাঠের দিকে তাকিয়ে মাথা মুছলো। তারপর ভেজা কাপড় ছপ ছপিয়ে এল।

এবারও সতীতলা তেমনি শূন্য। শুধু রাস্তার ওপর পড়ে একটু থমকে গেল আশা। কয়েকটি অচেনা ছেলে তার দিকে হা করে তাকিয়ে রয়েছে। এ শহরের কলেজের ছেলে। নাগরাঘাটে আশাকে নিয়ে ঘটনাটা দেখেছে।

রাগতে গিয়ে হাসি পেল আশার ওদের রকমসকম দেখে। ওদের পেরিয়ে এসে আশা শুনতে পেল, লাকী গার্ল্।

ক্লাস টেন অবধি পড়েছে আশা। ওকথাটার মানে জানে। তাই আরো হাসি পেল তার। সেই সঙ্গে দু' চোখের বিস্মৃত কৌতুকচ্ছটায় আবার সেই ছায়ারা ভেসে উঠল। সেই জন্যই ভাগ্যবতী আশা?

বোধহয়। নইলে এখনো কেন এমন বিস্মিত সংশয়ের ঘোর তার মনে। অবিশ্বাস্য, অথচ দূর-রহস্যের হাতছানির একটি ভয় খুশী খুশী ভাব ওর চেতনাকে এমন ঘিরে রয়েছে কেন? ও কি সত্যি সেই অন্ধকার ঘরটার পর্দায় ভেসে উঠবে? তবু কাউকে দেখতে পাবে না?

মায়ের বিরক্ত তীক্ষ্ণ চোখে চোখ পড়তেই সম্বিত ফিরলো আশার। মনে মনে বললো, ছিঃ নিশ্চয় আমি হাসছিলাম। রান্নাঘরের পিছনে, বাঁধানো চত্বরে যেতে যতক্ষণ ওকে দেখা গেল, ততক্ষণ মা ঠায় তাকিয়ে রইলো।

তারপর খেয়ে, কাজকর্মে কেটে গেল সারা বেলা। শ্যাম রাম ফেরেনি স্কুল থেকে। বোধহয়, ছুটির পর চলে গেছে নাগরাঘাটে।

ছুটির বেলা পার হয়ে যাওয়ায় মা-ই প্রথম বলেছে, হারামজাদারা গেছে সেখানে।

কিন্তু আশার বলতে বাধলো যে, সে খুঁজে দেখে আসবে কি না। অন্যদিন হলে পারতো আজ আশার ভয় ও লজ্জা হল।

অগ্রহায়ণের ছোট বেলায় ছায়া এল জলদে। কারখানাগুলির ছুটির বাঁশি বেজে উঠলো। কেন যেন মনে হয়েছিল আশার, আজ ফটিকদা সোজা এ বাড়ি চলে আসবে। এল না। কৃষ্ণকলির ঝাড়ে সারাদিনের বাসী ফুলগুলি আবার সতেজ হয়ে উঠতে লাগলো। উত্তর কোণের কাঁঠাল গাছটায় ফিরে এল কাকেরা। বাবা বাড়ি এল।

হরেন চক্রবর্তী স্থানীয় বাঙালীর কাপড় কলের নিম্নশ্রেণীর কেরানী। উঁচু করে কাপড় পরা, হাতা গুটনো মোটা কাপড়ের পাঞ্জাবী, রোগা লম্বা শরীরে ঝল্‌ঝল্ করে। নুয়ে পড়া ভারবাহী, সদ্য জোয়াল নামানো ক্লান্তিতে ধীর ও মন্থর। চল্লিশে চাল্‌সে না পড়লেও বার্ধক্যের পদক্ষেপ সর্বাঙ্গে।

আশা পালিয়ে গেল আগেই রান্নাঘরে। তাড়াতাড়ি উনুনে আগুন দিয়ে চা বসালে সে। যদিও কান খাড়া রাখলো, মা কী বলে।

কিন্তু মা কিছুই বললো না। বাবার হাত মুখ ধোয়া হয়ে গেল। মা হ্যারিকেনের চিমনী মুছছে ঘরে বসে। এমন সময় হরিশের ডাক শোনা গেল, হরেনদা আছেন নাকি ?

—কে ?

—আমি হরিশ।

বুক্‌টা ধড়াস্‌ ধড়াস্‌ করছে আশার। উনুনের ধোঁয়ায় ঢাকা পড়ে রইলো সে। রান্নাঘরে দম বন্ধ হয়ে আসছে। তবু বেরুতে পারলো না। শ্যাম-রামেরও গলা শোনা গেল। শ্রীমানেরা ফিরল এখন।

আবার বাবার গলা শোনা গেল, আরে কী খবর ভাই। কোনো চাঁদাটাদা নাকি।

—না, আপনার সঙ্গে একটু কথা ছিল। বসতে হবে।

—ও। তা হলে এস। কই গো, মাতুরটা পেতে দাও তো বারান্দায়।

আশা টের পেল, মাতুর পেতে দিল মা। হরিশের গলা শোনা গেল, ইনি কানাই মজুমদার, নাম শুনেছেন নিশ্চয়, সিনেমা ডিরেক্টর।

বাবার শোনবার কথা নয়। কারণ বাবা সিনেমা দেখে না। শোনা গেল, অ!

হরিশ বললো, আপনি শুনেছেন কিছু?

—না তো। এই আসছি। কেন, কী হয়েছে?

না খারাপ কিছু নয়, বরং শুভ। ওঁরা এসেছেন এখানে ছবির আউটডোরের কাজে। আমাদের এ পাড়ার বাড়িতেই ভাড়া আছেন। নাগরাঘাটে ওদের ছবি তোলার সময় আশা দেখতে গেছলো। তা আশাকে দেখে—

এবার কানুবাবুর গলা শোনা গেল, আমরা আপনার মেয়েকে একটি ছোট রোলে নিতে চাই। মানে, এই মেয়েটিকে পেলেই আমার সুবিধে হয়। আর কাজটাও এখানেই হয়ে যাবে। ওকে কলকাতার স্টুডিওতে যেতে হবে না। এখন আপনার যদি আপত্তি না থাকে।

হরিশ বললো, আপত্তি থাকবে কেন? পয়সা নিয়ে কাজ করবে। এমন কিছু পাপ কাজ নয়। এইতেই হয় তো আশা একদিন ফিলম্ স্টার হয়ে যাবে।

—ফিলম স্টার!

বাবার মোটা মন্থর গলায় যেন রাজ্যের বিস্ময় ফুটে উঠলো। তারপরে বললো, না. মানে আমাদের তো গরিবের ঘর। শুধু শাঁখা সিঁতুর দিয়েই মেয়ে পার করতে হবে তো। তাই আখেরের ভাবনাটা ভাবতে হবে।

আহা! আখেরের ভাবনা আবার কী? ভুরু জোড়া কুঁচকে নিজের মনেই বললো আশা। শাঁখা সিঁতুরের বেশী চাইছেই বা কে?

ফটিকদা কিছুই চায় না। আখের তো ঠিক হয়েই আছে। এখন যার ভাবনা, সে-ই ভাববে। তা সে সিনেমায় নামা হোক্ বা না হোক্। বাবার ধন দৌলত নেই, আশারও কিছু নেই, একটি মেয়েজীবন ছাড়া। সেটাও সে নিজের জন্যে রাখেনি, ফটিকদা নিয়ে নিয়েছে। জীবনটা যার সঙ্গে কাটবে।

অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল আশা। শুনতে পেল বাবার গলা, একটু চা খেয়ে যান। খুকী, ও খুকী?

আমাকেই ডাকছে বাবা। ও জবাব দিল, কী বলছ বাবা?

—এঁদের জন্যেও একটু চা করিস্ রে।

কিন্তু কী স্থির হল? একদম শুনতে পায়নি আশা। ও তাড়াতাড়ি অ্যালুমিনিয়ামের পাত্রে আরো জল ঢেলে দিল। দিয়ে বাইরে উঁকি মারতে যাবে, মা ঢুকলো। ঢুকে শিল পেতে বসলো। নোড়া দিয়ে হলুদ থেঁতো করতে করতে বললো, বাঁধা ঘোড়া-ই দিন-রাত্তির লাথি ছুঁড়ছে, এবার ছাড়া পেয়ে বেলেল্লার একশেষ হবে।

তার মানে, বাবা রাজী হয়ে গেছে? কিন্তু চুপ করে রইলো আশা।

মা আবার বললো, বে' তো কোনো কালে এমনিতেও হতো না, এবার কান পাতাও দায় হবে। ওই, টাকা আনবে আর স্বাধীন জেনানা হয়ে ব্যাটাছেলের হাত ধরে বেড়াবে।

তা হলে রাজী হয়ে গেছে বাবা। ভিতরে ভিতরে একটা হাসির উচ্ছ্বাসের মধ্যেও মনে মনে অবাক না হয়ে পারলো না আশা। মা যে কত রকম কথা বলে। তখন জিজ্ঞেস করলো টাকার কথা। যেন টাকা দিলে মায়ের আপত্তি নেই। এখন আবার রাগ করছে। তার কারণ আর কিছু নয়। ওই ফটিকদার ওপর বিতৃষ্ণা। অর্থাৎ, এখন থেকে আমি ফটিকদার সঙ্গে স্বাধীনভাবে মেলামেশা করব, আর লুকো-চুরির ধার ধারব না। এই মায়ের ভয়।

তা হাত ধরে বেড়াবার মত অতটা বেহায়া না হলেও, আর কার সঙ্গে আশা স্বাধীনভাবে মেলামেশা করবে।

আশা কোনো কথা বললো না। ওদের ময়লা ছোট ছোট কাপগুলি যতটা সম্ভব পরিষ্কার করে চা পরিবেশন করলো।

কানুবাবু বললেন, কাল তা হলে তুমি যেও। গাড়ি এসে তোমাকে নিয়ে যাবে সকালে। খাওয়া দাওয়া সব ওখানেই হবে, বুঝলে?

আশা বাবার দিকে একবার আড়চোখে তাকিয়ে ঘাড় ক্যাৎ করলো। বাবাও যেন একবার তাকালো একটু অবাক হয়ে! অনেক দিনের মধ্যে বোধ হয় মেয়েকে এরকম লক্ষ্য করে দেখবার দরকার হয়নি। শ্যাম রামও দেখছিল দিদিকে। সবাই দেখছিল। যেন দেখতেই এসেছে আশাকে। এবং সকলের পছন্দ হয়েছে।

আশা তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে গেল বাতি জ্বালাতে। সন্ধ্যা দেখাতে হবে। অন্ধকার নামছে একটু একটু করে। মশারা আক্রমণ শুরু করছে।

রাম ছুটে এসে বললো, তুই মোটরগাড়িতে ক'রে যাবি রোজ?

শ্যাম বললো, হ্যাঁ. ওতো এখন ফিলম স্টার। কিন্তু ছাখ্ দিদি. আমি কিন্তু আর ওই দড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে দেখব না, তোর সঙ্গে ভেতরে যাব।

রাম বললো, আর আমি মোটরে চেপে যাব তোর সঙ্গে।

আশা দু'জনকেই বললো, আচ্ছা, হবে সে সব।

কানুবাবুকে নিয়ে হরিশ চলে গেল। আশা দেখলো, বাবা রান্নাঘরে যাচ্ছে মায়ের কাছে। এই সুযোগ, আর এক মুহূর্তও দেরী নয়। সে বললো, রাম, শিগ্‌গির শাঁখটা বাজিয়ে দে না রে।

বলে সে বাতি নিয়ে চলে গেল রাংচিতের বেড়ার কাছে, তুলসীতলায়। ফিরে এসে ঘরের চৌকাঠে একটু গঙ্গাজল ছিটিয়েই দৌড়। রামের শঙ্খনাদ তখনো চলছে। আশা এক দৌড়ে পদ্মদের বাড়িতে। ফটিকদা নিশ্চয়ই এখানেই অপেক্ষা করছে। পদ্মর দাদা আশু. ফটিকদার খুব বন্ধু। ও বাড়ির সকলেই জানে, ফটিকের সঙ্গেই বিশেষ করে আশা দেখা করতে আসে এ বাড়িতে! শুধু পদ্মর মা জেনেও না জানার ভান করে।

আশা দৌড়ে এসে ঢুকেই থমকে দাঁড়ালো উঠোনের ওপর। দেখলো, ফটিকদা, আশুদা আর পদ্ম, তিনজনেই বসে আছে। ওরা যেন কী বলছিল। আশাকে দেখেই থেমে গেল।

আশা দেখলো, ফটিকদা মুখটা অন্যদিকে ফিরিয়ে রেখেছে কেন? রাগলে ফটিকদার চোখ দুটি কুঁচকে যায়' আর চোয়াল শক্ত হয়ে ওঠে। এখন সেরকম দেখাচ্ছে। কেন?

পদ্মই প্রথম হেসে বললো, কি হল? দাঁড়িয়ে রইলি যে, আয়।

আশুদা বললো, এস আশা।

আশার চোখের দিঘীতে গাঢ় অন্ধকার, তবু নক্ষত্রের ঝিকিমিকি। ফটিকদার মুখ থেকে ওর দৃষ্টি সরলো না। পরমুহূর্তেই সে চমকালো যখন দেখলো ফটিকদা সটান উঠে দাঁড়ালো।

ফটিক বললো, আমি চলি।

কাকে বললো, বোঝা গেল না। কিন্তু এগিয়ে এল দরজার দিকে। আশার কাছাকাছি আসতেই সে বললো, চলে যাচ্ছ।

ফটিক দাঁড়িয়ে বললো, হ্যাঁ।

—আমি এসেছি বলে?

চাপা কান্নার মত শোনালো আশার গলা।

—হ্যাঁ।

ফটিকের গলায় সমান ঝাঁজ। আশা কষ্ট করে ঢোক গিলে বললো, কেন?

—কেন? কেন আবার কি? আমার ইচ্ছে, আমি চলে যাব।

আশুদা বলে উঠলো, এই ফটিক, ঝগড়া করিস্ নে।

ফটিকদা তার সামনের আল্‌বোটের ঝাড়ে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে ঠোঁট উল্টে বললো, আমার বয়ে গেছে ঝগড়া করতে। ফটকে বাঁড়ুজ্জে লোহা কলে কাজ করে, তার এখন ফ্লিমস্টারের সংবাদ শোনবার সময় নেই। নিজের ঝাড়ে বাঁশ কাটি বাবা, পরের বাগানে আমি ফুল তুলতে চাইনে।

এমনি অদ্ভুত সব উপমা দিয়ে কথা বলা অভ্যাস ফটিকের। অন্য-সময় হ'লে, আশা হাসতো। এখন তার হাসি পেল না। সে শুধু চোখের পাতা তুলে ফটিকদার মুখটা একবার দেখলো।

ফটিক দু' পা এগিয়ে, আবার ফিরে দাঁড়ালো। বললো, এবার তোর মা কী বলবে? আমার সঙ্গে কথা বললে তো মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায়, আর এখন টাকার লালচে সিনেমায় নামতে দিলে সব শুদ্ধ হয়ে যায়, না? শালা ঝাঁটা মারি অমন পট্‌পটানির মুখে।

কথা শেষ করবার আগেই ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল ফটিক। আশা তেমনি মাথা নিচু ক'রে দাঁড়িয়ে রইলো। চোখ তুলে, পদ্ম আর আশুদার দিকে তাকাতে পারলো না। অপমান ও কষ্টে ওর বুকের ভিতর থেকে একটা তীব্র করুণ শব্দ বেরিয়ে আসতে চাইলো। উপ্‌চে পড়তে চাইলো ওর চোখের দিঘী। কিন্তু চুপ করে, শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো আশা। সদ্য বাঁধা খোঁপায়, নত কাঁধে, কান্না-চাপা স্থির প্রদীপ্ত চোখে, পদ্মদের সাঁঝ-আঁধার উঠোনে কান্নার চেয়ে বেশী শোকাহত দেখালো তাকে।

ফটিকদা অনেকবার রেগেছে। এমন করে রাগেনি। আশা প্রতিবারেই চুপ করে থেকেছে। কিন্তু এবারের নীরবতার মধ্যে, তার ভিতরে ভিতরে এত প্রবল কলরব সে শোনেনি। ওই দূর রহস্যের ছায়ায় যেতে আশার এত যে ভয় ও খুশী তাতে ফটিকদা এতটুকু সাহস, এক ছিটে হাসিও দিলে না। দেবেও না। বরং না গেলেই ফটিকদা খুশী হবে। কেন?

আশা জিজ্ঞেস করবে না। কিন্তু আশা কাঁদবেও না। কারণ, ফটিকদা এটুকু বুঝতে চায় না. আশার ভয়-অভয়, হাসি-কান্না, এ সংসারে শুধু একজনের কাছে তার প্রাপ্য অপ্রাপ্য মিটিয়ে নিতে চায়!

পদ্ম উঠে এল কাছে। বললো, বসবি নে আশা।

আশা বললো, না, দেরী হয়ে যাবে, মা খুঁজবে।

পদ্ম বললো, খুব রেগে গেছে ফটিকদা।

যেন তাতে যুক্তি আছে, এমনি সুর পদ্মর গলায়। মনে মনে তা হলে পদ্মও রুষ্ট। তাই বুঝি সকালে ভিড়ের মধ্যে পদ্ম দাঁড়িয়েছিল, ছুটে আসেনি।

আশা বললো, যাই।

বেরিয়ে এল সে। পথের দু' পাশে বাগানে ও বনে অন্ধকার দ্রুত জমা হচ্ছে। ডাক শোনা যাচ্ছে ঝিঁঝিঁর।

আশার ঠোঁটে এক বিচিত্র ভীত বিস্মিত হাসি দেখা দিল। মনে মনে বললো, এই জন্যেই বুঝি সেই প্রথমদিনের গাড়ির শব্দে চমকে উঠেছিলাম?

পরদিন সকালবেলায় সত্যি গাড়ি এল একেবারে গলির মধ্যে। এ গলিতে আর কোনদিন কেউ গাড়ি ঢুকতে দেখেনি। এ সেই প্রথম-দিনের দেখা গাড়িটা। সব বাড়ি থেকে সবাই উঁকি মারলো। ছোট ছোট এক দল ছেলেমেয়ে এল গাড়ির পিছনে। শ্যাম রাম ছুটে গেল পড়া ফেলে।

গাড়ি থেকে নেমে এল বিনয়। সেই ম্যারিনশার্ট, গলায় ক্যামেরা, চোখে গগলস্।

আশা তার মায়ের কাছে ছিল রান্নাঘরে। সে বেরিয়ে এল।

বিনয় বললো, একি, তৈরী হওনি?

আশা লজ্জায় হেসে বললো, এত তাড়াতাড়ি?

—বাঃ, কখন সবাই লোকেশনে চলে গেছে। নাও চটপট তৈরী হয়ে নাও। তোমার বাবা কোথায়?

—কাজে গেছেন।

—মা?

একটু সঙ্কুচিত হল আশা। বললো, মা রান্না করছেন।

বিনয় সঙ্গে সঙ্গে সম্বন্ধ পাতিয়ে বললো, মাসীমাকে বল না একটু চা খাওয়াতে।

বলে সে বারান্দার ওপরে বসে পড়লো। আশা তাড়াতাড়ি বললো, দাঁড়ান, একটা আসন দিই।

—না না, আসন টাসন লাগবে না। তুমি তৈরী হয়ে নাও তাড়াতাড়ি। আর হ্যাঁ, তুমি কি চান করেছ নাকি?

—না।

—করো না তা হলে। জামা কাপড় বাড়তি নিয়ে নাও, ওখানেই করবে। কারণ, মাথায় তেল দেবে কি না, কানুদা বলবেন। আজ হয় তো তোমার কাজ হবে।

আশা বারান্দা দিয়ে রান্না ঘরে গেল। মা তখন লুকিয়ে বিনয়কে দেখছিল। যদিও চায়ের জলটা চাপিয়ে দিয়েছিল আগেই।

মা জিজ্ঞেস করলো, ও কে?

আশা বললো, ওদের লোক।

মা একবার আশার আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বললো, ভাল কাপড়ের মধ্যে নীল তাঁতেরই আছে। কী পরে যাবি?

—যা বল।

মা আর ও-বিষয়ে কিছু বললো না। একেবারে অন্য কথা বললো, যাচ্ছ যাও, কিন্তু ওখানেই থেকো। ওখান থেকে আবার অন্য কোথাও টহল দিতে যেও না।

অর্থাৎ ফটিকদার সঙ্গে যেন কোথাও আড্ডা মারতে না যায় আশা। মা জানে না যে, ফটিকদা ওখানে হয় তো যাবেই না কোনদিন।

শ্যাম আর রাম ছুটে এল রান্নাঘরে। প্রায় একই সঙ্গে উচ্চারিত হল, দিদি, আমি যাব।

জবাব দিল মা, না কেউ যাবে না। সামনে পরীক্ষা, ইস্কুলে না

গিয়ে সব সিনেমা তোলা দেখতে যাবে। শিগ্‌গির চান করে খেয়ে ইস্কুলে চলে যা।

আশা বললো, মা, আজ রাম যাক।

মা একবার রামের দিকে তাকিয়ে চা তৈরী করতে লাগলো। অর্থাৎ আপত্তি নেই। কিন্তু শ্যাম একেবারে রুদ্র। কারণ রামের চেয়ে তার আকর্ষণটা বেশী। সে বড়, এখন সে লুকিয়ে দু' একটা সিনেমাও দেখাতে যায়। সিনেমা হলে গিয়ে শুধু ফটোও দেখে আসে। সে প্রায় খেঁকিয়ে উঠে আশাকে বললো, রাক্ষুসী আমি গেলে তোর কী হত?

—তুই কাল যাস্।

—যা, যেতে চাইনে তোদের ওই পেত্নীদের ফিলম্ দেখতে।

ব'লে সে দুপ্‌দাপ্ ক'রে বেরিয়ে গেল। মা বললো, দাঁড়া, তোর পিঠে ঘা কতক দিই।

আশা বিনয়কে চা দিয়ে হাতে মুখে সাবান দিল। ড্রেস্ দিয়ে নীল শাড়ি পরলো সাদা জামার ওপরে। ওর টিনের স্যুটকেশ থেকে সযত্নে রক্ষিত স্নো'র কৌটো বার করে মাখলো। চোখে কাজল দিল সরু করে। যেমন পূজোর সময় প্রতিমা দেখাতে গেলে সাজে, সেইরকম সাজলো। তারপর আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে, ঠোঁট কামড়ে ধরলো সে। ওগুলো লাল করতে পারবে না সে—ওই ছায়াদের মত। জামা কাপড় তার অতি সাধারণ। তবু মনে হচ্ছে, কত না জানি সেজেছি। লজ্জা করছে, তবু ছায়াদের মত না হতে পারার একটা দুর্বলতায় তাকে বিষণ্ণ দেখাতে লাগলো।

রামকে নিয়ে যাবার আগে, রান্নাঘরে গিয়ে বললো, যাচ্ছি।

মা একবারে মেয়েকে দেখে নিয়ে বললো, এস। যা বলেছি মনে থাকে যেন।

বিনয় বলল, বাঃ, বেশ হয়েছে। এক মিনিট ওই বেড়ার কাছে দাঁড়াও।

আশা রাংচিতের বেড়ার কাছে দাঁড়ালো। বিনয়ের ক্যামেরা ক্লিক্ করলো! চোখ থেকে ক্যামেরা সরিয়ে রাংচিতের ঝাড়ের কাছে এল সে হাসতে হাসতে। সবুজ পাতার ওপরে মস্ত বড় প্রজাপতিটা দেখিয়ে বললো, ছবিতে এসে গেছে এটা। এনলার্জ করলে দারুণ হবে। ঠিক তোমার মুখের পাশেই দেখা যাবে।

আশা বললো, সত্যি?

বলে ও ফিরে দেখলো, মস্তবড় প্রজাপতিটাকে। রাংচিতের ঘোর সবুজ মোটা পাতার ওপরে প্রজাপতিটা যেন ধ্যানমগ্ন, নিথর। একটুও কাঁপুনি নেই পাখায়। ও যেন ফটো তোলার জন্যেই পাখা দুটিকে ঈষৎ নামিয়ে, ক্যামেরাব মুখোমুখি হয়েছে। আশার মনে হল কয়েক-দিন আগের সেই বড় প্রজাপতিটা বোধহয। রাজ্যেব রং মেখে এসেছে সারা গা' জুড়ে। তার হাত নিস্‌পিসিয়ে উঠলো। সে হাত বাড়াল সন্তর্পনে।

বিনয় বললো, পারবে না ধরতে, পালাবে।

ঠিক সেই মুহূর্তেই আশার সরু সরু আঙুল যেন পাখির ঠোঁটের মত পতঙ্গটিকে ধরল। ধরে হাসতে হাসতে টান দিতেই একটা পাখা ছিঁড়ে এল। কী হল? থতিয়ে গিয়ে আর একটা পাখায় টান দিতেই দেখা গেল প্রজাপতিটা মরা। পাতার সঙ্গে যেন আঠা দিয়ে জোড়া। গুটিকয় পিঁপড়ে ইতিমধ্যেই, ছিদ্র করে ঢুকে গেছে পেটের মধ্যে।

রাম বলে উঠল, মরে গেছে রে দিদি।

বিনয় হেসে বললো, সেইজন্যেই শ্রীমান নট্ নড়নচডন। তা হোক গে-মরা, ছবিতে দারুণ এফেক্ট আসবে।

—আসবে। আশা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো।

বিনয় বললো, আসবে বৈ কি। একটা ছবি তো।

আশা হাসলো। কিন্তু একটা মরা প্রজাপতি তার মুখের পাশে কেমন করে জ্যান্ত দেখাবে। মনটা যেন কেমন আড়ষ্ট হয়ে রইলো আশার।

ড্রাইভার সামনের পোড়ো জায়গাটার মধ্যেই গাড়ি রেখেছিল। ওরা এসে উঠতেই গাড়ি ছাড়লো। পাড়ার সবাই আবার উঁকি ঝুঁকি মেরে দেখলো। আশার লজ্জা করতে লাগলো। মাথা নিচু করে বসে রইলো সে।

বড় রাস্তায় এসে গাড়ি পড়তেই সতীতলার দিকে দেখলো সে। কেউ নেই। পুরানো ভাঙা রাস্তা। গাড়িটা আস্তে আস্তে মোড় ঘুরতে যাবে। কে যেন চিলের মত শিস্ দিয়ে উঠলো পাশ থেকে। আশা দেখলো, ফটিকদার বন্ধু কার্তিক। সঙ্গে আরো দুটি পাড়ার ছেলে।

আশা ভুরু কুঁচকে মুখ ফেরালো। সেই মুহূর্তেই কানে এল, সতী-তলার হিরোইন চললেন।

আশার বুকে খচ করে বাজলো কথাটা। সতীতলার হিরোইন? ফটিকদার চেলারা তাকে এসব বলছে। ব্যাপারটা কোন্ পর্যায়ে গেছে, ভাবতে ভয় করছে আশার। মনে হল, চিংকার করে ছুটে বাড়ি গিয়ে দরজা বন্ধ করে পড়ে থাকে সে।

বিনয় বললো, গম্ভীর হলে যে। তোমাকেই বলেছে বুঝি।

রাম বলে উঠলো, হ্যাঁ ওরা ফটিকদার বন্ধু কিনা। সাণ্টুদা ওকথা বললো রে দিদি।

বিনয়ের সামনে আশা জোর করে হাসতে চাইলো। কিন্তু ওর কালো চোখ দুটিতে খর দুপুরের রৌদ্র ঝলকে উঠলো। ওর চোখের সামনে ভেসে উঠলো ফটিকদার মুখখানি। কাল সন্ধ্যার চেয়েও ওর ভিতরটা আরো শক্ত কঠিন হতে লাগলো।

বিনয় বললো, এ পাড়াটার নাম সতীতলা বুঝি।

আশা বললো, না। রাস্তাটার নাম বসন্ত ভট্টাচার্য রোড। তবে সতীতলাই বলে লোকে।

বিনয় বললো, ও! তা তোমাকে ওসব বলবেই লোকে। ছেলেরা পেছনে লাগবেই, বরাবর দেখলাম তাই।

তা বলে ফটিকদার বন্ধুরা। আর পাড়ার বড় ছেলেরা সবাই ফটিকদার বন্ধু। তবে ফটিকদাই আশার পিছনে লাগছে?

রাগ-ভয়-বিস্ময়, ত্রিমুখী সাঁড়াশিটা যেন আশার টুঁটি টিপে ধরলো। তবু আশৈশব ক্ষুধা ও দুঃখের সঙ্গে ঘর করা মেয়েটি যেমন চিরদিনই হেসেছে, তেমনি করেই হাসলো আশা। আঠারোয় আটচল্লিশ বছর ধরে দেখা বিচিত্র বিস্ময়কর দুঃখের দহনে বিষন্ন নম্রতা, এ সংসারের দায় আশার আয়ত্তে। সে তো স্তব্ধ বিস্ময়ে, অবাক হেসে আজীবন এ সংসারের দিকে তাকিয়েছিল। তবু তার উত্তীর্ণপ্রায় ষোড়শী কৈশোরে যেদিন আজন্ম চেনা ভোমরাটা ঝাঁপ খেয়ে পড়েছিল, সেদিন তার পাপড়ি ঢাকা সমস্ত রেণু শিউরে উঠেছিল। সংসার তাকে মারতে পারেনি। আজ সেই ফটিকদা তাকে, হেলা-ফেলায় বাঁচা মরা বুনো ঝাড়ে ফেলে দিতে চায়। দিক্। আশা কাঁদবে না। কারণ, এ সংসার তার জৈবিক সাধের উচ্ছ্বাসে যদি বা আঁতুড়ে প্রথম অভ্যাস বশে শাঁখ বাজিয়ে বরণ করেছিল আশাকে, আজ শ্মশানের শঙ্খও শত শত আশাকে আমন্ত্রণ করছে। তাই সুখে দুঃখে, মানুষেব মন নিয়ে বারে বারে বেঁচে থাকা ছাড়া, জটিল কিছু জানে না আশা। সে কাঁদবে কেন? হাসুক, আশা হাসুক।

নাগরাঘাটের উঁচু পাড়ে, বটের ছায়ায় সাউণ্ডভ্যানের পাশে এসে গাড়ি দাঁড়ালো। রামকে নিয়ে নেমে এল আশা। দেখলো, ভ্যানের কাছেই আজ বিভার পাশে পদ্মরা দাঁড়িয়ে আছে। সুষমা বাণীরাও আছে।

আশার যেতে ইচ্ছে করলো ওদের কাছে। কিন্তু দেখলো, বিভা খিল্‌খিল্ করে হেসে উঠলো। সেই সঙ্গে পদ্ম সুষমারাও।

তবু পদ্মকে জিজ্ঞেস করলো আশা, কখন এসেছিস্।

জবাব দিল সুষমা, সেই সাতসকালে।

বলে ওরা এমন টিপে টিপে হাসতে লাগলো, আশা মুখ না ফিরিয়ে পারলো না। বিনয়ের সঙ্গে নেমে গেল নদীর চড়ায়। আশা দেখলো,

আজকে দড়ির বেড়ার ওপারে লোক এসেছে আরো বেশী। এমন কী বোম্বাই মিঠাই আর চীনেবাদামওয়ালারাও এসেছে। শহরটা বুঝি ফাঁকা হয়ে গেছে আজ।

কানুবাবু আজ প্যান্টের ওপর শুধু গেঞ্জি গায়ে কাজে লেগে গেছেন। ক্যামেরাম্যান তার অ্যাসিস্ট্যান্টদের নিয়ে কাজে ব্যস্ত হিরোইন চঞ্চলা খালি গায়ে শাড়ি জড়িয়ে, পিঠে চুল ছড়িয়ে দিয়েছে কাঁখে কলসী। পাড়াগাঁয়ের আইবুড়ো মেয়েদের মত, তবু ঠিক যেন পাড়াগাঁয়ের নয়! ঠোঁট দুটিতে লাল টুকটুকে রং মাখা, মুখেও রং-এর প্রলেপ। চোখে কাজল। চুলগুলি তেলহীন রুক্ষ নয়, যেন সিল্কের মত মোলায়েম, মসৃন চকচকে।

দেখলো, বিজন মালকোঁচা দিয়ে কাপড় পরে শার্ট পরেছে। কাঁধে ঝুলিয়েছে সাইড্ ব্যাগ্। প্রায় যেন এ শহরের ছেলেদের মত, তবু ঠিক তা নয়! বিজনেরও মুখে রঙ। প্রাণেশ গলা-বন্ধ কোট পরে প্রস্তুত। হাতে লাঠি, মোটা গোঁফ।

কোথা থেকে একটি ছোট নৌকা আনা হয়েছে। মাঝি যেন চেনা চেনা মনে হয় আশার। আশাকে দেখতে পেয়ে কানুবাবু এগিয়ে এলেন। বললেন, তুমি মেক-আপটা সেরে ফেল।

বলে বিনয়কে ডাকালেন, বিনয়, একে এর কাপড়টা দাও। জামা খুলে, গাছকোমর বেঁধে শাড়ি পরবে। বিনুনি খুলে চুল এলোখোঁপা করে দেবে। আর··

আশার দিকে তাকালেন তীক্ষ্ণ চোখে। পা থেকে মাথা পর্যন্ত এমনভাবে দেখলেন আশার লজ্জা করলো। যেন আশাকে একটি মেয়ে হিসাবে দেখছেন না। গাছ কিংবা পাথর যাচাই করে দেখা কোনো জিনিস। বললেন, হুঁ, হালকা মেক-আপ দেবে, ঠোঁট আর ভুরু প্রমিনেণ্ট হবে, বুঝলে বিনয়। যাও তাঁবুতে নিয়ে যাও আশাকে।

বলে চলে গেলেন। বিনয় বললো, চল।

রাম বললো, আমি ?

বিনয় বললো, তুমি ওই গাছতলায় কি যেখানে খুশী দাঁড়িয়ে সব দেখ।

তবু রাম দিদির দিকে হা করে তাকিয়ে রইলো। আশা হাসলো ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে। কষ্ট হল তার। তবু চলে যেতে হল বিনয়ের সঙ্গে। একটু আড়ালে যেতে চাইছিল আশা। সে টের পাচ্ছিল, তার দিকে অনেকে তাকিয়ে আছে ওই দড়ির বেড়াটার ওপার থেকে। আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছিল বলাবলি করছিল যেন কী। ভাল না মন্দ, বিস্ময় না বিদ্রূপ, কে জানে। শুধু পালাতে ইচ্ছে করছিল। হয় তো, ফটিকদাও আছে ওই ভিড়ের মধ্যে। হয় তো কেন, নিশ্চয়ই আছে। তার বন্ধুরাও আছে।

কিন্তু আশা এখনো কানে শুনতে পায়। চোখ ফেরালে দেখতে পায়। সে বুঝি এখনো পুরোপুরি ছায়া হয়ে উঠতে পারেনি এই চঞ্চলার মত। যে তার দিকে তাকিয়ে এই মাত্র হাসলো। বললো, কই, আমার সঙ্গিনী কোথায় ? এখনো যে মেক-আপই হয়নি।

এই তো কনকদি কেমন আপন মনে কমলালেবু খেয়ে চলেছে। সুস্মিয়া গগলস্ পরে ক্যামেরাম্যান বিমলের সঙ্গে কী যেন বলছে আর হাসাহাসি করছে। ওদের দুজনের খুব ভাব। তারপরেই থির জলে বাতাসের মত লজ্জায় একটু কেঁপে উঠলো। দেখল বিজন তার কাছে দাঁড়িয়ে, তাকেই দেখছে অপাঙ্গে।

বিনয় বললো, কেমন ?

বিজন যেন ছায়ার স্বরে বললো, বেশ। চাপা চাপা একটা গ্ল্যামার আছে আশার।

বিনয় বললো, দেখছ কী ? কোন্‌দিন দেখবে, হিরোইন হয়ে গেছে।

—কিন্তু ও যে লজ্জা পাচ্ছে। চঞ্চলা বলে উঠলো।

সত্যি, শুধু লজ্জা নয়, আরো কিছু, যার নাম জানে না আশা।

তার চোখের পাতা নত হয়ে আসছে। সে তাড়াতাড়ি তাঁবুর মধ্যে ঢুকে পড়লো।

এখনো পুরোপুরি ছায়া হয়ে উঠতে পারেনি আশা। কিন্তু আজ তার অভিষেক। আজ সে ছায়া হবে। ছায়াদের রাজ্যে সে এসেছে। ছবির সজ্জা নেবে সে এবার। তারপর থেকে বাইরের কোনো কিছু, ফটিকদাদের কোনো কিছু আর দেখবে না, শুনবে না। দোহাই, দোহাই ভগবান, আশার যেন একটুও ভয় না করে। একটুও কান্না না পায়।

তাঁবুর মধ্যে ঘেরা জায়গায় কাপড় ছাড়লো আশা। কিন্তু ভীষণ লজ্জা করতে লাগলো তার। জামা ছাড়া শুধু শাড়ি পরে কোনোদিন বাইরের লোকের সামনে আসেনি সে। আয়নার দিকে চোখ পড়তে মনে হল, নিজের খোলা কাঁধ আর পিঠের অংশ সে নিজেও বুঝি দেখেনি কোনোদিন। কিন্তু দেশবিখ্যাত চঞ্চলা কত সহজে শুধু শাড়ি পরেছে। নির্বিকার হয়ে ঘুরছে সকলের চোখের সামনে।

ঘুরবেই, চঞ্চলা যে কাউকে দেখতে পায় না।

বিনয় ডাকলো, হল ?

আশা বেরিয়ে এল ডুরে শাড়ি গাছকোমর বেঁধে।

বিনয় দেখে বললো, অল্‌রাইট্‌। বিনুনি খুলে ফেল।

এমনভাবে বললো, আশা লজ্জা পাবার অবকাশ পেলো না। তারপর সে নিজেই মুখে রং মাখিয়ে দিল আশার। ভুরু এঁকে দিল। ঠোঁটে বুলিয়ে দিল লিপস্টীক্‌। চোখে টেনে দিল কাজল।

সাজতে সাজতে কান দুটি গরম হয়ে উঠছিল আশার। বিনয় তাকে এমন করে ধরছিল, এত ঘন হয়ে ছিল শরীরের সঙ্গে! বিনয়ের যেন খেয়াল নেই। কিন্তু কনকদি দেখছিলেন, আর কমলালেবু খাচ্ছিলেন। মনে হয় আশা অবাক হচ্ছিল, এত তাড়াতাড়ি অতগুলি লেবু ভদ্রমহিলা খেলেন কী করে। তবু লজ্জাই তার বেশী করছিল। উনি যেন হাসছিলেন ঠোঁট টিপে টিপে। সাজা হয়ে যাবার পর বললেন, মেক আপ্‌-এ দেখছি তোমার হাত আছে বিনয়।

বিনয় আশার দিকে চোখ রেখেই বললো, কেন, খারাপ হয়েছে কনকদি ?

—না। তাইতো বলছি। তোমার যে এমন হাত আছে, জানতাম না।

কিন্তু কনকদির প্রৌঢ় ঠোঁটের কোণ কি কেন্নোর মত কুঁকড়ে উঠলো একটু ?

বিনয় আশাকে ঠেলে দিল আয়নার দিকে, যাও দেখ কেমন হয়েছে। এবার চুল খোল। কানুদাকে ডাকি।

বলে সে বেরিয়ে গেল। আশা বিনুনি খুলতে খুলতে আয়নার কাছে গিয়ে থমকে দাঁড়ালো। এক মুহূর্ত যেন চিনতে অসুবিধে হল নিজেকে। পরমুহূর্তেই তার রং মাখা ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটে উঠলো। অপলক হল চোখ। নিজেকে দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল সে। তন্ময় হল, আঙুলগুলিতে অন্যমনস্ক জড়তা এল বিনুনি খুলতে। মনে মনে বললো, ছায়ার মত দেখাচ্ছে আমাকে।

কিন্তু কোথায় একটা অস্বস্তি, খচ্ খচ্ করছে। যেন দুটি অদৃশ্য চোখ, অনেক দূর থেকে তার দিকে ভ্রু কুঁচকে তাকিয়ে আছে।

কানুদা এলেন। দেখে বললেন, ঠিক আছে। ওই কলসীটা দাও তো বিনয় আশাকে, কাঁখে নিয়ে দাঁড়াক। হ্যাঁ, ঠিক আছে।

তারপর তিনি বোঝাতে লাগলেন, আশা কি করবে। ও যেন একটি পাড়াগাঁয়ের মেয়ে। নদীতে রোজ জল আনতে যায়। ওদের পাড়ার একটি মেয়েকে ও-একদিন দেখলো, রোজ নদী পারাপার করে এমনি একটি ছেলের সঙ্গে তার ভাব হয়েছে। রোজই দেখে, ওরা হাসে, কথা বলে। তারপর মেয়েটির ঘাটে আসা বন্ধ হয়ে গেল। ছেলেটি তখন আশাকেই মেয়েটির সন্ধান জিজ্ঞেস করে। আশা যেন ভয় পায়। তবু সে বলে দিল, চিনিয়েও দিল বাড়িটা। শেষে মেয়েটির সঙ্গে দেখা করে, সংবাদও এনে দিল। মেয়েটির নাকি বিয়ে হয়ে যাবে শিগ্‌গির, তাই তার ঘাটে আসা বন্ধ, ইত্যাদি। অর্থাৎ

নায়ক নায়িকার যোগাযোগ করার ব্যাপারে সাহায্য করবে আশা শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা ধরা পড়লে, আশাই একদিন ভয়ে সব কথা বলে ফেলবে মেয়েটির বাবাকে। এইটুকু করলেই হবে আশাকে। অবশ্য, এটুকু করতেই নাকি অনেকদিন লেগে যাবে।

বলে কানুদা চলে গেলেন। বিনয় বললো, চল বাইরে।

আশার পা' ছুটি যেন জড়িয়ে এল সঙ্কোচে। বললো, এখুনি কিছু করতে হবে নাকি ?

—না, সময় হলে কানুদা ডাকবেন। কিন্তু তাঁবুর মধ্যে বসে থাকবে কেন শুধু শুধু ?

আশা তাঁবুর বাইরে এল। কিন্তু সে দড়ির বেড়াটার দিকে তাকালো না। যদিও তার সর্বেন্দ্রিয় উজান ঠেলে ছুটে গেল ওই দিকেই।

প্রাণেশ তার ঝুটো গোঁফের ফাঁকে হেসে বললো, চমৎকার মানিয়েছে। তবে, চঞ্চলার সখী বলে মনে হবে না। ছোট বোন হলে মানাতো।

কিন্তু আশা তখন শুনতে পাচ্ছে, কে যেন ফটিকদার নাম ধরে চিৎকার করছে। তার কানে এল আবার, 'সতীতলার হিরোইন।' তারপরেই মিলিত গলার অট্টহাসির গুলি-বৃষ্টি হল যেন। শুধু আশারই কানে যাচ্ছিল এসব। এখানে, কারুর কোনো মনোযোগ নেই দড়ির বেড়ার ওপারে।

বিনয় তাকে ডেকে নিয়ে গেল গাছতলায়। ফটো নিল আবার। আশা শুনতে পেলো কানুদা বলছেন হরিশকে, আজ বড় গণ্ডগোল করছে সবাই।

হরিশ ছুটল দড়ির বেড়ার দিকে। আশার ভয় হল। আর সঙ্গে সঙ্গেই তার ভয়ের বাস্তব শব্দটা সে শুনতে পেলো ফটিকদার গলায়, কেন, এ নাগরাঘাটের বাগানও কি বিনোদ ভট্চাযের জমিদারী নাকি ?

হরিশও চিৎকার করে উঠ্‌লো, তোমরা গণ্ডগোল থামাবে কিনা, জানতে চাই।

ফটিকদাও চিৎকার করে বললো, তুমি কে হে হরিদাস ?

রাম ছুটে এল আশার কাছে। বললো, দিদি ফটিকদা ঝগড়া করছে।

ততক্ষণে কানুদা বিনয় সবাই ছুটে গেছে সেখানে। রাম আবার বললো, ফটিকদা বেড়া ডিঙিয়ে আসতে চাইছে. না ?

আশা অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বললো, জানি নে।

রাম দিদির হাত ধরে ঝাঁকানি দিয়ে বললো, তুই ফটিকদাকে বারণ কর না ঝগড়া করতে।

আশা তা' পারবে না বলতে। ফটিকদাও আশার কোনো বারণ আর কোনোদিন শুনবে না।

তারপর গণ্ডগোল থেমে এল। কানুদা'রা ফিরে এলেন। আশা শুনতে পেলো ক্যামেরাম্যান বিমল জিজ্ঞেস করছে, মাস্তানটি কে মশায় ?

হরিশ বললো, কে আবার। আমাদের শহরে এরকম অনেক আছে। চিরদিনই এরা এরকম করে।

কানুদা বললেন, না হরিশবাবু এর চেয়ে সাংঘাতিক ছেলেদের পাল্লায় আমাকে পড়তে হয়েছে। এ ছেলেটি তো তবু আমার কথা শুনলো। অনেক জায়গায় ক্যামেরা পর্যন্ত ভেঙে দিয়েছে।

তারপরেই ডাক পড়লো আশার। দুরদুরিয়ে উঠলো আশার বুকের মধ্যে। এবার কাজ শুরু। নদীর উঁচু পাড় থেকে ঝোপ ঝাড়ের ...্য দিয়ে চঞ্চলার পিছু পিছু নেমে আসতে হবে আশাকে। কাঁখে ...কবে কলসী। আশা যেন চঞ্চলার দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসে।

...কিন্তু এ তো সত্যি জল আনতে যাওয়া নয়। তাই বারে বারে ...পাড়ে ওঠা নামা করেও মনের মত ওঠা নামা হয় না। এ তো আর ...ত্য মিটিমিটি হাসি নয়। তাই হেসেও হাসি ঠিক হতে চায় না। ...াকে সাইলেন্ট শট্‌ বলে।

মনের মত যখন হল, তখন ঘণ্টা কাবার হয়ে গেছে। তারপর ঘাটে পা ডুবিয়ে নামা, জল ভরা শেষ হতে হতেই অগ্রহায়ণের দক্ষিণায়ন-বেলা ঢল খেয়ে যায়। খাওয়ার ডাক পড়ে।

কিন্তু রাম? আশা বসবে কেমন করে খেতে? সে রামের হাত ধরে, তাঁবুর বাইরেই দাঁড়িয়ে থাকে। কানুদা তাঁবুতে ঢুকতে গিয়ে বললেন, কী ব্যাপার? এটি কে?

—ভাই।

—দাঁড়িয়ে কেন? ওকে নিয়ে বসে পড়। এস তো খোকা, তুমি আমার সঙ্গে এস।

রাম আর দিদির দিকে ফিরে তাকালো না। আহ্বান মাত্র আজ্ঞা পালন। আশাকে বিনয় ডেকে বসালো তার পাশে। আশা দেখলো, চঞ্চলা, অনসূয়া, বিমল আর বিজন নেই।

আশা জিজ্ঞেস করলো, চঞ্চলাদিরা খাবেন না?

বিনয় বললো, খাচ্ছে তো। ওরা গাড়িতে বসে খাচ্ছে। তোমার লজ্জা করছে এখানে খেতে?

—না।

বিনয় হাত তুলে হা হা করে উঠে বললো, এখানে, এখানে দাও ওটা, আশার পয়লা দিন আজ।

আশা লজ্জায় কাঁটা হয়ে দেখলো, সামনের এগিয়ে আসা-হাতার মস্ত বড় মুড়োটা তার পাতে পড়লে। সবাই হেসে বললো, হ্যাঁ ঠিক হয়েছে।

আশা সলজ্জ চোখের পাতা একবার তুলেই দেখলো, রাম হা ব[illegible] তাকিয়ে আছে মুড়োটার দিকে। কারণ, এমন ভাবে দিদির পা[illegible] মুড়ো পড়তে কোনদিন দেখেনি ও। কিন্তু মরে গেলেও আশা এখ[illegible] ভাইকে একটু ভেঙে দিতে পারবে না। অথচ ভাইয়ের সামনে খা[illegible] যায় কেমন করে তাও সে জানে না। লোকে কিছু বোঝে[illegible] শুধু রুইয়ের ঝোলমাখা গলিত গোল চোখ দুটি অপলক তাকিয়ে র[illegible]

তার দিকে। যেন একটা কপিশ বুড়োটে চোখে তীব্র শ্লেষ। আঙুলে দিয়ে একটা চোখ গেলে দিল আশা। কানা মুড়োটাকে ভাঙল একটু একটু করে। একটু একটু করে খেতে হল তাকে। সে জানলো, কেমন করে খাওয়া যায়।

সারাদিনে আর আশার ডাক পড়লো না আজ। সূর্য অস্ত গেল। কানুবাবুর নির্দেশ শোনা গেল, প্যাক্ আপ্।

আশা তার নিজের জামা কাপড় পরে নিল। ভুরু ঠোঁটের রং মুছতে যাচ্ছিল সে। বিনয় পিছন থেকে বলে উঠলো, থাক্ না। অত ব্যস্ত কেন? বাড়ি গিয়ে তুলো।

কিন্তু মা কি ভাববে? পাড়ার লোকেরা যখন দেখবে, কি বলবে?

হরিশও বলে উঠল, হ্যাঁ থাক্ না।

আশার নজরে পড়েছে, হরিশ তাকে বারে বারে লক্ষ্য করছে। ঘন ঘন কাছে আসছে। প্রশংসা করেছে অনেকবার। রাম যেন কি বক্‌বক্ করে বলছে।

রং মুছল না আশা। সে তাঁবুর বাইরে এল। দেখলো ভিড় ভেঙে গেছে। দড়ির বেড়া নেই। অনেকে তাঁবুর চারপাশে এসে ভিড় করেছে।

আশা রামের হাত ধরে উঁচু পাড়ে উঠলো। বিনয় তাদের পিছনে। উঠেই, বাঁ দিকের মুচকুন্দ চাঁপার তলায় দেখলো বিভাকে। আর তার পাশে ফটিকদা। পাশাপাশি, প্রায় গায়ে গায়ে। বিভা হাসছে টিপে টিপে। কি যেন বলছে ফিস্‌ফিস্ করে। বিভা আর ফটিকদা পুরনো বন্ধু। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ওদের ভাব হয়ে গেছে আবার।

তবু একটা অদৃশ্য প্রেত-বাতাস যেন আশার শিরদাঁড়ায় কষে ঝাপটা দিল। তবু একটি জ্বলন্ত আগুনের গলিত ধারা যেন তার কানের পাশ দিয়ে মস্তিষ্কের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে পড়লো। তার বুকের মধ্যে কতকগুলি শাণিত অদৃশ্য নখ আঁচড়াতে লাগলো।

রাম বলল, দিদি, ফটিকদা।

আশা নিচু গলায় বলল, থাক্ আয়।

আশা দেখতে চায় না। শুনতে চায় না। হতে চায়। ছবি হয়ে সব কিছু দেখাশোনার বাইরে থাকতে চায়। সে আপন মনে লীলা করে। যাকে সবাই দেখে সে কাউকে দেখে না।

তবু আশার বুকের মধ্যে একটি রুদ্ধস্বর ফিস্‌ফিস্ করে বললো, ওদের দুজনের মাঝে আমি শুধু জোর করে দাঁড়িয়েছিলাম।

তারপর আশার মনে হল, এ জন্যেই বুঝি সে প্রথম দিন গাড়ির শব্দে চমকে উঠেছিল!

বিনয় বললো, বাড়ি যাবে আশা, না বেড়াবে একটু?

আশা বললো, বাড়ি যাব।

—তাহলে চঞ্চলাদির সঙ্গে চলে যাও। তোমাদের গলির মোড়ে নামিয়ে দেবে।

চঞ্চলা ডাকল আশাকে। আশা পুরোপুরি ছায়া হতে চাইলো। হেসে, সহজ লাস্যে যেন সে গাড়িতে গিয়ে উঠলো। শুধু রামটা একবারও দিদির মুখ থেকে চোখ সরালো না। ফটিকদাকে দেখেও, দিদি দাঁড়ায় না, কথা বলে না, এমন অভাবিত ব্যাপার সে ভাবতে পারে না।

গাড়ি থেকে নেমে গলিতে যখন পা বাড়ালো আশা, তখন সন্ধ্যা ঘনিয়েছে। গলিটা জনশূন্য।

রাম বললো, দিদি ফটিকদার সঙ্গে তোর ঝগড়া হয়ে গেছে?

আশা বললো, চুপ কর দিকিনি।

চুপ করলো রাম। কিন্তু তারপরেই তার বিচিত্র জিজ্ঞাসা, মাছের মুড়োটা খেয়ে তোর খুব পেট ভরে গেছলো, না?

আশা জবাব দিল না। এবং এই সারাদিন পরে, রাম আবার বললো, তোকে বেশ সুন্দর দেখাচ্ছিল।

আশা বলল, যাঃ।

—সত্যি। ঠিক ওদের মত।

অর্থাৎ ছায়াদের মত। সারা জীবন ছায়া হয়ে থাকতে চায় আশা।

বাড়ি এসে কাপড় ছেড়ে, রং তুলে, মায়ের সঙ্গে সংসারের কাজে লেগে গেল আশা। মা তাকে লক্ষ্য করে করে দেখলো। ছাড়া ছাড়া দু'একটি কথা জিজ্ঞেস করলো। রামে শ্যামে ঝগড়া করলো।

একসময়ে বিনয় এল প্রডাকশন ম্যানেজার শঙ্করবাবুকে নিয়ে। বারো টাকা দিয়ে গেল আশার পারিশ্রমিক। তারপর খাওয়া দাওয়ার পাট চুকিয়ে শুতে যাবার আগে মা বললো, কাল তো দেখলাম আনন্দ আর ধরে না। আজ কী হল?

আশা বললো, কিছু নয়, বড্ড ঘুম পাচ্ছে।

কিন্তু ঘুম কোথায়! শ্যাম আর রামের পাশে শুয়ে, তার দুই চোখ আকাশের তারা-গোনা দীঘিটার মত অতন্দ্র হয়ে রইলো। মাত্র দু'বছর আগে হলেও, সেই দিনগুলি আবিষ্কারের বিষয় হয়ে উঠলো। পদ্মদের বাড়িতে যাওয়া ষোল বছর বয়সের সেই দিনগুলি। যে-দিনগুলির হিসেবের আওতায় শুধু কিশোরী-লজ্জা, ভয় অথচ এক কৌতুকোজ্জ্বল খুশীর ছড়াছড়ি। দুটি চোখ, যার চাউনিকে অসভ্য বলতে পারলে ভাল হত, কিন্তু বলা যায়নি। সভ্যও বলা যায়নি। সভ্য অসভ্য নয়, অন্য কিছু, যাতে ভয় করেছে, তবু রক্তে একটা দুরন্ত ঘূর্ণি লেগেছে। যা তাকে প্রত্যহ বিকেলে ডেকে নিয়ে গেছে নিশির মত। পদ্ম বুঝত, কিছু বলত না। আশুদা তার বন্ধুর ব্যাপারটা লক্ষ্য করছিল।

তারপর, সেই দিনটা। যেদিন পদ্ম আশুদা, কেউ ছিল না বাড়িতে। পদ্মর মা ছিলেন পিছনের পুকুরে ব্যস্ত। শুধু দুজন।

ফটিকদা যেন বোকার মত বলেছিল, পদ্মকে নিয়ে আশু ডাক্তারের কাছে গেছে।

আশা বলেছিল, তা হলে আমি যাই।

ফটিকদা বলেছিল, বস না।

বসতে পারেনি আশা। দাঁড়িয়ে থাকতেও যে কী ভীষণ ভয় করছিল। তবু তৎক্ষণাৎ চলে যেতে পারেনি। কতকগুলি স্তব্ধ মুহূর্ত ; গোটা বিকেলটাই রুদ্ধশ্বাস হয়ে উঠেছিল। তারপর ফটিকদার মত একটা বড় ছেলে, আশুদা'দের বন্ধু, কেমন কাঁপা কাঁপা মোটা গলায় বলেছিল, তুমি এলে ভাল লাগে আশা।

আশার মুখটা মুহূর্তে নীচে নেমে এসেছিল। পরমুহূর্তেই সে দেখেছিল, তার চিবুকে ফটিকদার মোটা মোটা আঙুলগুলি কাঁপছে। আশার মনে হয়েছিল তার বুক ফেটে কান্না আসছে। আশ্চর্য! তাকে জোর করে চাপতে গিয়ে আশা দেখলো, সে হেসে ফেলেছে। হেসে ত্রস্তে ফিরে এক দৌড়ে সে বাড়ি। সারারাত সে ঘুমোতে পারেনি। তিনদিন পদ্মদের বাড়ি যেতে পারেনি। অথচ নিশির হাতছানি তাকে অস্থির করেছিল রোজ। শেষে পদ্ম জোর করে নিয়ে গিয়েছিল। আর তিনদিন বাদে ফটিকদাকে দেখে সে বুঝেছিল ফটিকদাকে ছাড়া ওই ক'দিন সে আর কিছু ভাবেনি। সেই ভাবনাটাই তারপর কাজে অকাজে চলায় ফেরায় মিলেমিশে আজ এখানে এসে দাঁড়িয়েছে। আজ, কত সহজে ফটিকদা সরে গেছে, বিভার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছে।

এতদিন তো একটুও বুঝতে পারেনি আশা শুধু একটু সুযোগের অপেক্ষায় ছিল ওরা দুটিতে। তাই বুঝি সেদিন এমনি করে চমকে উঠেছিল আশা? তাই বুঝি ছায়াদের কাছে ডাক পড়লো তার, আর ফটিকদার সময় হল বিভার কাছে যাবার। এতদিনে বিবাদ মেটাবার। না জেনে বিভাকে কষ্ট দিয়ে মেরেছে এতদিন আশা।

অথচ, ফটিকদাকে বিভাই নাকি একদিন অপমান করেছিল। ফটিকদা কখনো বিভার নাম উচ্চারণ করতো না। শুধু একদিন বলেছিল, দ্যাখ আশা, বিভাদের মত মেয়েরা কখনো একটা অ্যাটেন-ডেন্স ক্লার্ককে ভালবাসতে পারে না। ও কোনোদিন কাউকে ভালবাসবে না।

সে যে শুধু রাগের কথা, আজ আর তা বুঝতে বাকী নেই। কিন্তু আগামী পৌষ মাসে আঠারো পেরিয়ে উনিশে পড়বে আশা। তাকে যে কোন মূল্য দিয়ে আজ সে কথা বুঝতে হবে।

আশা দু'হাত দিয়ে চোখ ঢাকতে গেল। না, তার কান্না পায়নি। চোখ বড় জ্বলছে। তার রক্তে রক্তে যেন বিষের জ্বালা। তার ঠোঁটে, তার বুকে, প্রতি অঙ্গে অঙ্গে। কারণ শরীর আজ অনুকূল নয়, নির্জন কঠিন শিলায় আশার এই ছোট ছোট নির্ঝরিণী দেহে সর্বত্র ফটিকদার পদক্ষেপ কঠিন শক্ত গভীর।

সহসা রামের ঘুমন্ত একটি হাত এসে পড়লো আশার গায়ে। দু'হাত দিয়ে ভাইয়ের হাতটি জড়িয়ে ধরলো সে। ছোট্ট ঠাণ্ডা হাত খানি যেন তার সারা জীবনের প্রতীক হয়ে বুকে এসে পড়লো। তার বাবার হাত, মায়ের হাত, এ সংসারের হাত এর চেয়ে বড় শক্তি ও উত্তাপ নিয়ে কোনোদিনই আসেনি।

আশা কাঁদবে না। কারণ সংসার এমনি। রামের হাতটি সে বুকের মধ্যে ঢুকিয়ে নিল। রাম কথাই শিখেছে, বয়স হয়নি। স্পর্শ পেয়ে মা ভেবেই বুঝি ও দিদির কোল ঘেঁষে এল। অন্ধকারে রামের মুখখানি দেখবার চেষ্টা করলো আশা। তার চোখে যেন স্নেহময়ী বিষণ্ণ মায়ের হাসি দেখা দিল। সে চোখ বুজলো।

আশা বুঝি ছায়াই হয়ে গেল। রোজ গাড়ি আসে সকালে। সে নাগরাঘাটে যায়। রোজই কম বেশী কাজ হয়। ফিরে আসে সন্ধ্যায়। গাড়ি এসে তাকে পৌঁছে দিয়ে যায়। শুধু রবিবারটা ছুটি।

এর মধ্যে একটি রবিবার গেছে। সেই দিনটিও ওদের সঙ্গেই কাটিয়েছে আশা। সারাদিন বিনোদ ভট্‌চাযের ভাড়াটে বাড়িতে ওদের সঙ্গে গল্প করেছে। সেখানে প্রত্যহ যজ্ঞিবাড়ির আয়োজন। প্রচুর লোকের রান্না বসে। এক এক বারে ত্রিশ চল্লিশ কাপ চা হয়।

কোনো দল তাস খেলে, কোনো দল গানের আসর বসায়। কোনো ল শুধু গল্প।

একদিন সন্ধ্যায় চঞ্চলার সঙ্গে তার গাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিল আশা। পুল পেরিয়ে নদীর ওপার ফাঁকা পাকা রাস্তা। দুপাশে ধানকাটা মাঠ। যাবার সময় আশা দেখলো পুলের ওপর বিভা আর ফটিকদা।

বিনা টিট্‌কারিতে এখন রাস্তা দিয়ে চলতে পারে না আশা। পদ্ম সুষমারা একদিনও খোঁজ নিতে আসে না আর।

নাগরাঘাটে কিংবা বিনোদ ভট্‌চাযের বাড়ি যাওয়া আসার পথে বুঝি সতীতলার পাখিরাই ডাক দিয়ে ফেরায় তাকে একবার। চোখ টেনে নেয় চকিতে।

সতীতলায় আর কোনোদিন যাবে না আশা। কেবল বিনয় যখন কারণে অকারণে তার হাত ধরে, তখন তার বুকের মধ্যে চমকে ওঠে। সে আড়ষ্ট হয়ে ওঠে ভিতরে ভিতরে। তবু হাসে। বিনয় যখন গাড়ি নিয়ে কোনো কাজে শহরে যায় আশাও ঘুরে আসে তার সঙ্গে। ফটিকদা বিভারা দেখুক, আশা এখন ছায়া। আশা ছবি হয়ে গেছে। সে আর কোনো দিন কাউকে দেখতে পাবে না।

তবু দেখতে পেল আশা। সেদিন এই শীতের বেলায় যখন আকাশে মেঘ দেখা দিল, কাজ গেল বন্ধ হয়ে। সবাই নৌকো পেরিয়ে বাগানে বাগানে মাঠে ঘাটে বেড়াতে চললো। কানুদাও বাদ গেলেন না। চঞ্চলা বিজন প্রাণেশ সবাই।

একসময়ে আশা নিজেকে আবিষ্কার করল নির্জন ঝোপে বিনয়ের বাহুপাশে।

বিনয় চুপি চুপি বললো, রাগ করছ আশা?

হ্যাঁ করছে। কিন্তু বিনয়ের ওপর নয়, নিজের প্রতি। নিজেকে তার ঘৃণা করছে। তবু সে হাসলো যখন তার চোখের সামনে ভেসে উঠলো ফটিকদা। সে যেন দেখতে পেল ফটিকদা আর বিভাকে। ফটিকদা ভালবাসছে বিভাকে।

আশা হেসে বললো, না।

বিনয়ের নিশ্বাসে পুড়ে গেল আশার মুখ। তার ঠোঁট নেমে এল আশার ঠোঁটের ওপর। আশার বুকের ভিতর থেকে যেন বাঘিনী নখ বিস্তার করে কেউ চিৎকার করে উঠল নিঃশব্দে। শ্বাস রুদ্ধ হয়ে এল তার। চোখে বুঝি জল আসে।

বিনয় একটু অবাক হয়ে বললো, কী হল আশা?

আশা প্রায় ফিস্ ফিস্ করে বললো, সবাই যেখানে আছে, সেখানে যাই চলুন।

বিনয় সহজ গলায় বললো, চল যাই।

ফিরে এল আশা। একেবারে বাড়িতে চলে এল। এসে মুখের রং মুছলো। মা দেখলো তাকিয়ে তাকিয়ে। মা কি কিছু বুঝতে পারে? কে জানে। মা চিরদিন ধরেই অমনি তীক্ষ্ণ অনুসন্ধিৎসু চোখে তাকিয়ে আছে আশার দিকে। থাকতে থাকতে, হঠাৎ এক একদিন কিছু বলে ওঠে। তখন বোঝা যায়, মা একেবারে অবুঝ নয়। কারণ, এ মায়ের পেটেই আশা জন্মেছে।

রং মুছে আশা পায়ে পায়ে পদ্মদের বাড়ির দরজায় এসে দাঁড়ালো। কেন যে এল, নিজেও জানে না। এসে দেখলো, পদ্মর চুল বেঁধে দিচ্ছে সুষমা।

পদ্ম সুষমা দুজনেই অবাক হল একটু। তারপর পদ্ম জিজ্ঞেস করলো, বাবা! এতদিন বাদে আজ এলি যে বড়?

আশা বললো, এলাম। তুই তো আর খোঁজ নিসনে।

—তোর খোঁজ নেওয়া কি এখন চাট্টিখানি কথা?

সুষমা বললো,আসলে আশা ফটিকদার খোঁজ নিতে এসেছে, না রে?

আশা জবাব দেবার আগেই পদ্ম বললো, ফটিকদা আর বিভা আজ কলকাতা গেছে।

আশা হাসলো। বললো তোরা তোদের কথাই বলছিস্। আজ কাজ নেই, তাই এসেছি।

পদ্ম বললো, বস তাহলে।

আশা বসলো না। সে যেন একটি সুদীর্ঘ বর্শার খোঁচায় বেঁকে দাঁড়িয়ে রইলো। নদীর ওপারের নির্জন ঝোপে, বিনয়ের বাহুপাশ থেকে মুক্ত হয়ে কেন ছুটে এসেছিল আশা? নিজের সঙ্গে মিথ্যাচারের অপরাধ তাকে ডেকে এনেছিল এখানে। মিথ্যে নয়, সে শুধু একবারটি দেখতে চেয়েছিল ফটিকদাকে।

জেনে শুনেও আশা নাটকীয় ভঙ্গীতে বললো, বসব না চলি। তোরা বস।

পিছন থেকে সুষমা ছুঁড়ে দিল, বসেই তো আছি।

তারপর মিলিত চাপা হাসি।

আশা গেল বিনোদ ভট্চাযের সেই বাড়িতে। কেউ বেড়িয়ে ফেরেনি। শুধু বিমল আর অনুসূয়া গল্প করছে। ফিরে এল আশা। ফিরে, সতীতলার দিকে তাকিয়ে থমকে দাঁড়ালে। পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল মন্দিরটার কাছে। মেঘ ঢাকা অন্ধকারেরা বিকেলবেলাতেই ভিড় করেছে বটের ঝুরির কোলে কোলে। ঝিঁ ঝিঁ ডাকছে। এখানকার বাসিন্দা পাখিরা অবাক হয়ে তাকালো, তাদের চেনা চেনা মেয়েটির দিকে। দূরে সরে বসলো। উড়ে পালালো না। আর আশার বুক কাঁপিয়ে সাইকেলের ঘন্টা বেজে উঠলো, ক্রীং ক্রীং···। ফিরে দেখলো আশা, কোনো এক কাজের লোক ঘরে ফিরছে।

আশারও ঘরে অনেক কাজ। সে বাড়ি ফিরে গেল। সতীতলার মন্দিরের কোল আঁধার সন্ধ্যাতারা-প্রবীন-চোখে তাকিয়ে রইলো তার দিকে।

শেষ বারের জন্য প্যাক্ আপ্ হয়ে গেল ফিলম্ কোম্পানির মালপত্র। বাইশ দিন বাদে ওরা ফিরে চললো কলকাতায়। কানুদার সঙ্গে সবাই আশাকে নিমন্ত্রণ করলো কলকাতায়।

কানুদা বললেন, আশা যেন তাঁদের অফিসে আসে। এই রইল ঠিকানা। তাকে দরকার পড়লে লোক পাঠিয়ে নিয়ে যাবেন কানুদা। স্টুডিওতে আসতে পারে আশা। হরিশবাবুর সঙ্গেই আসতে পারে। তা' ছাড়া কানুবাবুদেরও দরকার হতে পারে আবার এখানে। তখন যেন আশা প্রস্তুত থাকে।

বিনয় বললো আড়ালে, যদি রাগ না কর তো মাঝে মাঝে বেড়াতে আসব আশা।

আশা বললো, আসবেন।

—তুমি এস কলকাতায়।

আশা হাসলো। কান্না পেতে লাগলো তার। ভয় করতে লাগলো। ছায়ারা চলে যাচ্ছে। এবার আর সত্যি করে কিংবা মিথ্যে করেও কোথাও যাবার থাকলো না তার। যদি চলে যেতে পারতো আশা।

সে বিনয়কে জিজ্ঞেস করলো, কবে বেরুবে ছবি?

বিনয় বললো, মাস দুয়েকের মধ্যেই রিলিজ হবে। সংবাদ পাবে তার আগেই।

যেমন করে একদিন লাইন বেঁধে গাড়িগুলি এসেছিল তেমনি লাইন বেঁধে চলে গেল। এবার আর একটা গাড়ি বেশি ছিল। রাস্তার দু'পাশে লোকে ভিড় করে আবার ওদের যাওয়া দেখলো। আশা বাড়ি ফিরে এসে দেখলো, রংচিতের বেড়াগুলি বড় ফাঁকা ফাঁকা লাগছে। পাতা ঝরে যাচ্ছে রোজ। সে তো অনেকদিন উঠোন ঝাঁট দেয়নি, তাই নজরে পড়েনি। উত্তরদিকের পাঁচিলের কাছে কৃষ্ণকলির ঝাড়েও পাতা ঝরে যাচ্ছে রুক্ষ কাঠিসার হয়ে উঠছে। তারপর কুটোকাটির জট হয়ে যাবে। অপেক্ষায় থাকবে বৃষ্টির। এখন আর খৈ নেই, কৃষ্ণকলির সেই কালো গোলমরিচের মত বীচি। যার ভিতরে শাদা শীস থাকে খৈ-এর মত দেখতে। আজ লক্ষ্য করে দেখলো আশা, কুকুরের বাচ্চাগুলিকে। মায়ের হাজার বিরক্তি আর

রাগ সত্ত্বেও, কুকুরটাকে একবার তাড়িয়েও টের পাওয়া যায়নি কখন এক পাল বাচ্চা বিইয়েছে। সন্ধ্যা হয়ে এল। শ্যাম রামের গলা শোনা যাচ্ছে সামনের পোড়ো ভিটেয়। ওরা এসে কুকুরবাচ্চাগুলিকে ঘাঁটবে। মায়ের বকুনি শুনে তবে হাত পা ধুয়ে পড়তে বসবে।

বাবার আসার সময় হল। মা'র বাসন মাজার শব্দ শোনা যাচ্ছে কুয়োরপাড়ের চাতালে। ঘরে গিয়ে হ্যারিকেনের চিমনি মুছতে লাগলো আশা। এসব কাজ আরো আগেই হয়ে যায়। আজ ওরা গেল বলে দেরি হল আশার। তাড়াতাড়ি করেই বা লাভ কী হত। অন্যসময় এসব কাজ সেরে, আশা পদ্মদের বাড়ি যেত। না হয় সুষমাদের বাড়ি। ফাঁক পেয়ে, রায়েদের বাগানের ভিতর দিয়ে একেবারে নদীর ধারে। যদি আগে থাকতে কথা থাকত সেইরকম। কিংবা সতীতলার মন্দিরের পিছনে। তারপর সন্ধ্যার আগ্ মুহূর্তে বাড়ি এসে সন্ধ্যেবাতি দেখাতো।

এখন আর বিকেলটাকে ফাঁক রেখে কী লাভ। ছায়ারা চলে গেল। আশা যদি চলে যেতে পারতো। আর কোনদিন কি ডাক আসবে না। ছায়া হয়ে চলে যেতে চায় আশা। এ শহরে আর থাকতে চায় না।

বাতি জ্বালালো। জ্বলিয়ে এই প্রথম নজরে পড়লো আশার, পুরনো মান্ধাতার আমলের ট্রাঙ্কটায় তালা বন্ধ। কোনোদিনই তালা বন্ধ থাকত না ওটা। এখন থাকে, মা সযত্নে চাবি সরিয়ে রাখে। একদিন শুনেছিল আশা, বাবা বলছিল মাকে, পোস্টঅফিসের একটা খাতা করলে হয়।

মা বলেছিল, দরকার নেই। সই মেলানো নিয়ে নাকি বড় ঝঞ্ঝাট করে পোস্টঅফিসে। তা ছাড়া, দরকারই বা কী। ও কি আর ধরে রাখা যাবে?

বাবা বলেছিল, তা ঠিক। খুকীকে একটা ভাল শাড়ি কিনে দিলে হয়।

খুকী হল আশার ডাক নাম। যে-নামে শুধু বাবা মা তাকে ডাকে। মা বলেছিল, কত রকম যে বলছ, তার ঠিক নেই। সেদিন বললে, ব্রঞ্জের ওপর সোনার পালিশ দিয়ে কয়েক গাছা চুড়ি করে দেবে খুকীকে। তা আনা বারো সোনা কিনতে গেলেই গোটা আশি টাকা বেরিয়ে যাবে, এদিকে তো রোজই এক আধ টাকা করে খরচ হয়ে যাচ্ছে। বলেছিলে, একটা মিস্তিরি লাগিয়ে ছাদের ফুটোফাটা-গুলো বোজাবে ফের বর্ষা আসার আগেই, তার চেয়ে এক কাজ করো না কেন?

—কি বল তো?

—তোমাদের মিলের কো-অপারেটিভের খান কয়েক শেয়ার কিনলে পাঁচশো টাকা ধার পাওয়া যাবে।

বাবা বলেছিল, তা মন্দ বলনি। বে যদি দিতে পারি, তখন তো টাকার দরকার হবেই। চুড়ি-টুড়ি ওই টাকা তুলেই হবে। তবে, পাঁচশো টাকা ধার করলে কুড়ি টাকা মাসে মাসে যখন কাটবে।

তারপর দুজনেই চুপ করে গিয়েছিল, যেন কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারেনি। তালা বন্ধ ট্রাঙ্কটার দিকে তাকিয়ে সেই কথাগুলি মনে পড়ল আশার। একশো বত্রিশ টাকা পেয়েছে আশা। সেই টাকাটা আছে ট্রাঙ্কের মধ্যে। টাকা না থাকলে কত ভাবনা। থাকলে কত নতুন চিন্তা পেয়ে বসে মানুষকে। তবু একঘেয়ে চিন্তার চেয়ে, নতুন চিন্তা বোধহয় ভাল, আরো টাকা যদি থাকত! এইরকম ভাবে যদি রোজকার করতে পারত আশা। আর কি কখনো তার ডাক পড়বে না।

বাবার গলা খাঁকারি শুনতে পেল আশা। তাড়াতাড়ি ঘরের চৌকাঠে জলের ছিটে দিয়ে, তুলসীতলায় বাতি দেখিয়ে, শাঁখ বাজিয়ে দিল, দিয়েই ছুটল রান্নাঘরে। ঘুঁটে জ্বালিয়ে, চায়ের জল গরম করে, কয়লা ঢেলে দিতে হবে। তার মধ্যেই বাবা বসে একটা বিড়ি খাবে,

তারপর হাতমুখ ধুয়ে নেবে। মা এসে পড়ল বাসন ধুয়ে। শ্যাম রামও এসে প'ড়েছে।

বাবা ডেকে বলল, হ্যাঁরে খুকী; ওরা আজ গেল বুঝি?

আশা বললো, হ্যাঁ বাবা।

বাবা বললো, হরিশ বলছিল তাই। বললে, ওদের ছবিটা বেরিয়ে গেলে নাকি তোর নাম হয়ে যেতে পারে, তখন সবাই তোকে ডাকবে, বলে বাবা হাসলো। মা বলে উঠলো, কিন্তু তোমার ভাবনা তোমাকে ভাবতে হবে। তাতে চুপ করে থাকলে চলবে না।

অর্থাৎ আশার বিয়ের ভাবনা।

বাবা যেন হাসির মধ্যেও একটি দুশ্চিন্তার দীর্ঘশ্বাস ফেললো, তবু বললো, দেখি ছবিটা বেরোক।

এখন সেই দিনটিরই প্রতীক্ষা, ছায়াদের রাজ্যে, আশার স্থায়ীবাসের পরীক্ষা হবে সেইদিন। চিরদিন পুরোপুরি, কিছু না-দেখা, কিছু-না শোনা, ছায়া হয়ে সে থাকতে পারবে কি না, সেইদিন জানা যাবে।

এখন সামনে শুধু একূল ওকূলের সংশয়ে, একলা জীবন কাটানো। একূল ওকূল আর নয়। একটা কূল তো গেছেই। এখন শুধু আর একটি কূলে ভেড়ার সংশয়। যদি নিরসনের সার্থকতা আসে, তবে এখানে আর থাকবে না আশা। একদণ্ড নয়, এক মুহূর্ত নয়, তার আঁতুড়ের রক্তে গন্ধে নিশ্বাস মেশানো এই দেশ ছেড়ে চলে যাবার ইচ্ছায় সে বড় ব্যাকুল হয়েছে। এ শহরে সে জলের মাছ ছিল। আজ চারপাশে তার কঠিন মাটিতে খাবি খাওয়া মরণের ভয়। আশা চলে যেতে চায়।

বাবাকে চা দিয়ে, উনুনে কয়লা ঢেলে দিল সে, মাকে চা দিল, নিজেরটা নিয়ে গিয়ে বসল শ্যাম রামের পড়ার জায়গায়। দুজনেই কাঁথা জড়িয়ে পড়তে বসেছে। এখন আর শ্যাম রাম রোজ ফিল্ম আর শুটিং নিয়ে আলোচনা করে না। প্রথম প্রথম খেতে, বসতে, পড়তে

খালি এক কথা, এখন আর বলে না। সংসারে ওদের এত বিষয় আছে যে একটাতে বেশীদিন মনোযোগ দেবার সময় নেই। রাত্রে বাতি জ্বালিয়ে কারা ব্যাডমিণ্টন খেলে, এদের ক্যারাম বোর্ড ভাল, কোন পাড়ায় এঁদো জায়গায় কুকুরের বাচ্চা জন্মেছে, কিংবা শহরের পাঁচ মিশেলী বিষয় ওদের আলোচ্য। এবং সেসব আলোচনা গুরুতর তর্কের বিষয়। তর্কেতে এঁটে উঠতে না পারলেই, আট বছরের সঙ্গে চৌদ্দ বছরের রাম রাবণের লড়াই শুরু হয়ে যায়, তখন মাকে এসে সেই লঙ্কা-কাণ্ড থামাতে হয়।

এখন কী করবে আশা? মা গেছে রান্নাঘরে, বাবার বাইরে কোথাও আড্ডা নেই। একবার মার কাছে যাবে রান্নাঘরে। একবার এখানে আসবে, আবার উঠে চলে যাবে। দোকানপাটে যাবার দরকারও হয় না, অভ্যাসমত সেটা কারখানার ছুটির পরই সেরে আসে। বাবা-মা'র একটা জুটি। দু ভাইয়ে একটা জুটি। আশা মনে মনে একলা ছিল না। অনেক কথা আপনি আপনি মনে জমা হত। সেসব কথা বলার জন্য রাত পোহাবার অধৈর্য প্রতীক্ষায় থাকত। কথা যদি নাও থাকত, তবু শুধু সতীতলায় কিংবা পদ্মদের বাড়ি যাবার ব্যাকুল হাতছানি থাকত।

এখন? পদ্ম কি করে? সুষমা বাণীরা কি করে? ওদের কি আশার মত অবস্থা? কে জানে, পদ্মকে তো প্রায়ই দেখতে আসে। সম্বন্ধ স্থির হয়ে গেলেই ও স্বস্তি পায়, সুষমারও তাই। বাণীর সঙ্গে অবশ্য আশুদার খুব ভাব। কিন্তু আশার মত অবস্থা নয়, ভাসা ভাসা ভাল লাগা ভাব দুজনের। কিন্তু আশা কী করবে। কেন সে এমন করে মিশতে গিয়েছিল, কেন সে পদ্ম সুষমা বাণীদের মত সাবধান থাকতে পারল না। ওরা কেমন হাসছে, খেলছে. কোথাও কোনো অনাসৃষ্টি নেই, কে আশাকে মাথার দিব্যি দিয়েছিল, অল্প বয়সে সাহস করে এমন আগুনে হাত বাড়াতে? ছি ছি! এজন্যেই বাবা মা শাসন করে। বুঝি এমনি করেই আশা নষ্ট হল ভ্রষ্ট হল, নইলে মন এমন

করছে কেন? নইলে বাড়ানো হাত ফিরিয়ে এনে তাকে দগ্ধ ভয়ঙ্কর মনে হচ্ছে কেন?

কেউ দিব্যি দেয়নি। তার মন থেকে স্বভাব উজানে সে গিয়েছিল, তার ভিতরের অচিন পাখিটা দিব্যি দিয়েছিল তাকে, কিন্তু আজ আর কেউ তাকে রক্ষা করবে না। এখন সে যেদিকে তাকায়, তার সব শূন্য মনে হচ্ছে। একটা ভয়ঙ্কর হাহাকার তার বুকের মধ্যে মাথা কুটে মরছে। কিন্তু কাউকে সে কিছু বলতে পারবে না। ইশারায় জানাতে পারবে না। সে সবই করবে। কাজ করবে, নদীতে নাইতে যাবে, বেণী বাঁধবে, হাসবে, কথা বলবে। এ সংসার তাকে কাঁদবার দুঃখ করবার অধিকারও দেয়নি। এ অধিকার জোর করে নেবার নয়। এ কোনো প্রকাশ্য কলঙ্কও নয়, এ শুধু যেন খেলতে গিয়ে পোড়ানো হাতের দাগ ও ব্যথা সবাইকে লুকিয়ে বেড়ানো। কিন্তু কেমন করে রাখা যায়? কেমন করে?

উঠে গেল আশা। বাবা মা রান্নাঘরে। অন্ধকারে বারান্দা পেরিয়ে কুয়োতলার অন্ধকার চাতালে, পাঁচিলে হেলান দিয়ে দাঁড়ালো আশা। দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে। দু'হাতে মুখ চেপে রইলো।

পৌষের শীতার্ত উত্তরে বাতাস পাঁচিলের গায়ে এসে লাগলো। ঝিঁ ঝিঁ ডাকছে একটানা। আকাশ পরিষ্কার, নক্ষত্রেরা স্থির একাগ্র হয়ে তাকিয়ে আছে। কুকুর বাচ্চাগুলি ডাকছে কুঁই কুঁই করে। কারখানার বয়লারের শব্দ আসছে ভেসে।

আস্তে আস্তে নিশ্বাস ফেলে, মুখ থেকে হাত নামালো আশা। সে কাঁদেনি। কাঁদবে না। এ পাড়ায় ও পাড়ায়, গোটা শহরের মানুষের কত কথা শোনা যায়। সেই সব কথা যদি সত্যি হয়, তবু তারা যদি হেসে খেলে কাটাতে পারে, আশা কেন পারবে না। না পারলেই বা শুনছে কেন? সংসার এমনি।

মায়ের ডাক শোনা গেল খুকী।

চট করে জবাব দিতে পারল না আশা। চাতালের অন্ধকার থেকে

জবাব দেয় বা কেমন করে। ও চলে আসবার আগেই মা আরো তুবার ডাকলে। তারপর রান্নাঘরের সামনা সামনি দেখা হয়ে গেল। মা এক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে বললো, তুটো হলুদ বেটে দে।

নতুন পাতা দেখা দিতে লাগল গাছে, লাল ফুলগুলি নেশায় পাগল হয়ে ফুটলো শিমুলে আর মাদারে। কৃষ্ণচূড়ার ডালে ডালে থোকা থোকা শক্ত কুঁড়িতে প্রথম রক্তাভা যেন চুঁইয়ে আসছে। কাঁসা রঙ বোল্ আমগাছে। আশাদের বাড়ির কাঁঠাল গাছে লোমশ ইতুরের মত ইঁচড় ধরেছে।

নিরালার টইট্‌ম্বুর পরিত্যক্ত দীঘিটির মত তুটি চোখ আশার। তবু বড় দরিদ্রের মত, ঘাটে যেতে রোজ না দেখে পারে নি, সতীতলার জট-পাকানো, ঝুড়ি নামানো, নাতীপুতি সবংশ ন্যাড়া বটকে। আবার দেখল প্রত্যহ চিকচিকিয়ে ওঠা শ্যাম পাতা। নদীতে জল শুকোল। তবু নদী গহীন। শুধু শ্যাওলাদের জট জলের উপর ভেসে উঠেছে।

আর কোনদিন সতীতলার রাস্তায় কোন মোটরগাড়ি আসেনি। ও পথে এখন বড় ধূলো। কত সাইকেলের ঘণ্টা বাজে ক্রীং ক্রীং। এখন শুধু বটতলায় বটতলার পাখিরাই বুঝি চমকায়। নয় তো ওরাও ভুলে গেছে।

সবই তার নিত্য চক্র প্রবাহে একই রকম ঘুরছে, সবাই তেমন রইল। তবু আশা যেন এপাড়া ওপাড়ায় তুষ্ট ক্ষতের মত হয়ে রইল। যেখান দিয়ে যায়, 'সতীতলার হিরোইন' ক্ষত দগ্‌দগিয়ে ওঠে। সেই বিদ্রুপ আর শিস্।

শুধু ঘাটে পদ্ম সুষমাদের সঙ্গে দেখা হয়। পদ্ম বাড়িও যেতে বলে। ফটিকদার কথাও বলে। বলে, ফটিকদা আজকাল বড় একটা আসে না। বলে, ঠোঁট টিপে হাসে। তারপরে বলে, প্রত্যেক রোববার কাতা যাওয়া চাই ফটিকদার। আর ফটিকদা টাকা পয়সা নিয়ে তার মা'র সঙ্গে ভারী ঝগড়া করে।

সেই গানটির কথা মনে পড়ে আশার। 'ত্রিবেণীতে বাণ ডাকল ওরে তুই জলে নেমে বাঁধ দে, ডুব সাতার দিয়ে সেই মীনকে ধর, কিন্তু তোর গায়ে যেন জলের ছিটে না লাগে।' ফটিকদার কথা শুনেও, মুখের ভাব অবিকৃত রাখতে চায় আশা। কথাবার্তায় কিছুই টের পেতে দিতে চায় না। পদ্ম সুষমাদের শুধু নয়। নিজের সঙ্গেও তার একই বোঝাপড়া. এ সংসারে সবাই গায়ে জলের ছিটে না লাগিয়ে চলতে চাইছে। নইলে, এ উনিশ বছর ধরেই বা বাঁচা গেল কেমন করে।

কলকাতা থেকে আর কোনো সংবাদ আসেনি, ছায়াদের কাছে ডাক পড়েনি আর। হরিশ এসে মাঝে মাঝে সংবাদ দেয়। জোর কদম কাজ চলছে। খুব শিগ্‌গির বেরোবে ছবি, আশা ইচ্ছে করলে ঘুরে আসতে পারে হরিশে সঙ্গে।

কি করবে গিয়ে শুধু শুধু? এদিকে প্রতীক্ষা বাড়ছে। মাঝে মাঝে কাগজে সংবাদ বেরুচ্ছে ছবির। এ শহরের উত্তেজনাও বাড়ছে, এ শহরের সঙ্গে ছবিটার যোগাযোগ আছে। সেই সঙ্গে আশার যোগা-যোগের কথা কেউ ভোলে না। সতীতলার হিরোইন কী খেলা দেখিয়েছে, একবার দেখতে হবে।

শ্যাম রাম সংবাদ আনে, এ শহরে ছবিটা আসবে। এবং তাদের দাবী হচ্ছে, ছাখ, দিদি, আগেই বলে রাখছি, ফার্স্ট ক্লাসের পাস নিবি। ত্বদিন দেখব।

শ্যাম বলে, হ্যাঁ ফার্স্ট ক্লাসে কোনদিন ছবি দেখিনি। এবার পর পর ত্বদিন দেখব।

রাম বলে, আমার ত্বটো বন্ধু দেখতে চেয়েছে। দিদি, তোকে পাস দিতে হবে।

আশা বুঝতে পারে, বাবা মা'য়েরও একটি আড়ষ্ট প্রতীক্ষা রয়েছে। আশার নিজেরও প্রতীক্ষা। সে ছায়া হবে, ছায়া হয়ে হাসবে কাঁদবে। সে কিছু ফিরে দেখবে না। তাই সেও কাল গুনছে।

একদিন শ্যাম বাড়ি এল ছুটতে ছুটতে, হাতে কাগজ।

আশা বারান্দায় বসে চুল বাঁধছিল।

শ্যাম বললো, দিদি, তোর নাম দেয়নি কাগজে।

আশা বললো, কিসের ?

—সিনেমার। এই দ্যাখ্; ছবির নাম 'পারাপার', ভূমিকায় চঞ্চলা, বিজন, প্রাণেশ, কনক, অনুসূয়া, সুলতান প্রভৃতি। তোর নাম বাদ।

চুলের গুছিতে গিঁট দেওয়া ফিতে তখন আশা দাঁত দিয়ে চেপে ধরেছে। সে বললো, আমার নাম দেবে কেন ? যারা নামকরা তাদেরই নাম দেবে।

তবু ফিতেটাকে আরো কষে দাঁতে চাপলো আশা। তার বুকের মধ্যে সেই পুরনো চমকটা কেমন যেন গুরুগুরু মেঘের স্বরে ডেকে উঠলো। দৃষ্টি সে ফিরিয়ে রাখলো অন্যদিকে।

শ্যাম বললো, সবাই বলছে, তোকে নাকি একদম পাত্তাই দেবে না ওরা। বলছে, তোকে নাকি দেখতে ভাল নয়, তুই কিছু পারিসনি।

বেণীর বাঁধন যত শক্ত করতে গেল আশা, ততই শিথিল হতে লাগলো। বললো, তা সত্যিই তো।

কিন্তু আশার ভয় করতে লাগলো মাকে। মা তার দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে রয়েছে রান্না ঘরের দরজা দিয়ে। আয়নার কাছে যাবার অছিলায় আশা ঘরে উঠে গেল।

তারপর একদিন বিকেলে হরিশ এল বৃষ্টি মাথায় করে, এ শহরের সিনেমা হলে 'পারাপার' এসেছে। আশাদের দেখবার জন্য কমপ্লিমেণ্টরি পাস পাঠিয়েছে কলকাতা থেকে। দশ বারো জন যেতে পারে।

আশা নিজের হাতে পাস নিল। নিয়ে তার জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছা করলো হরিশকে, কানুদা, বিনয় তার কথা বলেছে কি না। তার আগেই হরিশ বললো, কানুদা তোমাকে কলকাতায় যেতে বলেছেন। বলেছেন, সিনেমা করাটাই তো বড় কথা নয়। এলে গেলে একটা রিলেশন থাকে। ওকে আসতে বলবেন।

আশা হেসে বললো, যাব।

হরিশ চলে গেল।

আশা তার বাবার হাতে পাস দিল। শ্যাম পাশের কাগজটা দেখবার জন্য দৌড়ে এল।

বাবা হেসে বললো, তুই যাবি তো দেখতে ?

আশা বললে, তুমি আর মা শ্যাম রামকে নিয়ে দেখে এস, আমি পরে যাব।

পরদিন বাবা এক ঘণ্টা আগে ছুটি নিয়ে এল, এসে তাড়াতাড়ি দাড়ি কামালো। আর হাসতে হাসতে বারবার বললো, কারখানার লোক-গুলো পাগল। খালি বলে, ও চক্কোত্তিদা তোমার মেয়ের সিনেমা আমাদেরও দেখাতে হবে !

মা আজ সেই তাঁতের নীল শাড়িটা পরল। কতকাল পরে বুঝি সাবান দিয়ে মুখও ধুয়েছে। রামকে আশা নিজেই সাজিয়ে দিল।

বাড়িতে কয়েক ঘণ্টা একলা থাকাটা আশার নতুন নয়। সবাই বেরিয়ে যাবার পর, রান্না নিয়ে ব্যস্ত হয়ে রইলো সে, তবু কেমন একটি অস্থিরতা তাকে কাজে আড়ষ্ট করে রাখলো। এ শহরের, এ পাড়ার চেনা মানুষের মুখগুলি তার চোখের সামনে ভাসতে লাগলো। একটি অন্ধকার ঘরে, সেই মানুষগুলির মুখ ভাসছে।

আকাশে মেঘ করেছে। অন্ধকার রাত্রিটা ঝাপটা খাচ্ছে পুবের বাতাসে, বৃষ্টির জল জমেছে বাড়ির আশেপাশে। ব্যাংগুলি যেন অষ্টম-প্রহরের গানে মেতেছে। ঝিঁ ঝিঁদের ডাক আজকাল বদলেছে, কেমন যেন মৃদু অথচ গম্ভীর শোনায়।

ডাল বসিয়ে আশা বাইরে এসে দাঁড়ালো। বাংচিতের বেড়া আবার ঝাঁকড়ালো হয়েছে, কাঁঠাল গাছের কান-খাড়া পাতাগুলি বাতাসের ঝাপটায় সাঁই সাঁই করছে, কৃষ্ণকলির গন্ধ পাচ্ছে আশা।

হঠাৎ বাইরে, জলের ওপর কার পায়ের ছুপ্ ছুপ্ শব্দ শোনা গেল। আশা শক্ত হয়ে দাঁড়ালো। সহসা শিরদাঁড়া বেয়ে, চেতনাগ্রাসী একটি

বিচিত্র ভয় ও কামনায় শিউরে উঠলো সে। ঢুপ্ ঢুপ্ শব্দটা এগিয়ে এল আরো। এবার শুধু একটি গলার স্বর, চাপা কিন্তু স্পষ্ট বেজে উঠবে। তখন আশা কী করবে?

আরো কাছে এল শব্দটা। কিন্তু থামলো না। বাঁক নিয়ে চলে গেল সামনের পোড়োভিটার দিকে। বোধহয়, পোড়োভিটের বেওয়ারিশ বাসিন্দা সেই বুড়িটা ফিরলো ভিক্ষে করে, নইলে এসময়ে ওদিকে কে যাবে।

আস্তে আস্তে আবার শিরদাঁড়া বেয়েই চেতনা ফিরে এল আশার। আর সেই মুহূর্তেই, ভয়ংকর লজ্জায় নিজেই নিজের কাছে মরমে মরে গেল সে। বড় বেহায়া নির্লজ্জ এ প্রাণ। নইলে, এখনো এমন করে চমকায় কেন আশা।

পুবে বাতাসে কাঁপা অন্ধকার আকাশের তলা থেকে তাড়াতাড়ি পালিয়ে এল আশা। এ বাড়ি বড় খারাপ! জোনাকিরা কেমন অস্থির হয়ে ঘুরে মরছে, ঢুপ্ ঢুপ্ পায়ের শব্দ এখানে এলো না। যদি ঢুপ্ ঢুপ্ শব্দে আশা নিজে বেরিয়ে যায়? সে পালিয়ে এল রান্নাঘরে, লম্ফর আলোয়। এসে উনুনের ধারে বসলো মুখ ঢেকে।

একটু পরেই অনেকগুলি পায়ের শব্দ কানে এল আশার।

তারপরেই শ্যামের গলা, দিদি, তোর নামটা সবশেষে ছোট্ট করে দিয়েছে।

রাম বললো, তোকে মাত্তর দু'বার দেখিয়েছে রে দিদি। একবার দূর থেকে ঘড়া কাঁখে। আর একবার তোকে ওই হিরো জিজ্ঞেস করলে, 'শিবানীদের বাড়ি কোথায়?' তুই সঙ্গে গিয়ে বাড়িটা দেখিয়ে দিলি। ব্যস্!

শ্যাম বললো, হরিশদা বললে, ছবি অনেক বড় হয়ে যাবে, সেইজন্য তোকে কেটে বাদ দিয়েছে। তবে ছবিটা খুব দারুণ হয়েছে। মা কেঁদে ফেলেছে।

আশা বাইরে এসে হাসলো। বাবা বারান্দায় বসে একটা বিড়ি

ধরায়। মা কাপড় ছাড়তে গেল ভিতরে। বাবা মা, দুজনের কেউই কোনো কথা বললো না।

আশা স্বাভাবিক গলায় বললো ভাইয়েদের, রান্না হয়ে গেছে। হাত পা ধুয়ে খেতে আয়।

তারপরে রান্না ঘরে এসে দাঁড়ালো। ভাঙা পুরনো ইঁট বের করা দেয়ালে ধোঁয়া লেগে লেগে কালো হয়ে গেছে। সেখানে আশার ছায়াটা লম্ফর আলোয় এলোমেলো হয়ে কাঁপতে লাগলো। মনে হল, হাঁটু মুড়ে বসতে গেলে হঠাৎ কোথায় ভীষণ খোঁচা লেগে লুটিয়ে পড়বে আশা।

কিন্তু আশা আস্তে আস্তে বসলো। ঠোঁটের কোণে অদ্ভুত একটু হাসি দেখা গেল ওর। ও ভাবলো, মোটর গাড়ির শব্দ শুনে এ জন্যেই বুঝি চমকেছিলাম তখন।

রামের গলা শোনা গেল, দিদি, মা বললে, বাবার ভাতও বাড়িস্।

মা রান্না ঘরে এল না। আশা দেখলো, মা সকলের ঠাঁই করছে বারান্দায়। আশা সকলের ভাত বেড়ে দিল। মা বসেছিল বাবার কাছেই।

বাবা হঠাৎ মুখ তুলে আশার দিকে তাকালো। কী আশা করে বাবা দেখতে গিয়েছিল, কে জানে। বাবার চোখের দিকে তাকিয়ে আশার ছুটে পালাতে ইচ্ছে করলো।

মা বললো বাবাকে, তোমাদের কারখানা থেকে কারা মেয়ে দেখতে আসবে বলেছিলে? এ রোববারেই তাদের আসতে বল।

বাবা মুখ নামিয়ে বললো, বলব।

আশা রান্না ঘরে চলে গেল।

তারপর দেখতে আশার পালা, বিবাহযোগ্য সেই সব পাত্রদের অভিভাবকেরা এলেন গেলেন, তাঁদের ছক বাঁধা সীমায় পা ফেলে ফেলে।

টাকা চাইনে রূপ চাই শুধু, সেখানে আশা ফেল। টাকা চাই, রূপ চাইনে। সেখানে বাবা ফেল। পাঁচটি শেয়ারের পাঁচশো টাকা ঋণের সাধ্যে সে বাঁধা। আর শুধু তুটি ডাগর চোখ ও ডহর চুলে তো রূপসীর রূপ বেঁধে রাখা যায় না।

তা বলে আশার রূপ কি ছিল না? ছিল। চোখের দেখায় যা প্রকাশ পায় নি, আর একটি হৃদয়ের মন্ত্রে সে যে তিল তিল রূপে তিলোত্তমা হয়। মেয়ে যারা দেখতে আসে, তাদের সেকথা বোঝানো যায় না। কারণ, সে-মন্ত্র কেউ চুক্তি আর যুক্তির বীজ দিয়ে বুনে আনে না।

শেষটায়, গান্ধী নারী সমবায় সমিতির সম্বন্ধটাকে আর ছাড়া গেল না। সেখানে মেয়েরাই সূতো কাটে, হাতে তাঁত চালায়। এখন চরকা কাটার কাজ। মাস গেলে বত্রিশ টাকা মাইনে। তার ওপরে, সূতো কাটার ওপরে, হিসেবে কিছু কমিশন পাওয়া যাবে। মাসের শেষে পঞ্চাশে গিয়ে উঠবে বর্তমানে। যেতে হবে অবশ্য কলকাতা পেরিয়ে, আরো একটু দক্ষিণে। গান্ধী নারী সমবায়ের কারখানা সেখানে।

মন স্থির করেও বাবা অস্থিরভাবে আশার সামনে দাঁড়িয়ে বললো, কী যে করব, বুঝতে পারছি না।

আশা তার টিনের স্যুটকেসটি নিয়ে বসে বললো, কী আবার করবে বাবা। আমি যাব, তবে আমি তো তোমাদের কখনো ছেড়ে থাকিনি। মাঝে মাঝে আমি বাড়ি পালিয়ে আসব।

বাবা গোঙানোর মত হেসে বললো, কী যে বলিস্।

মা বাবাকে শুধু বললো, তবু যা হোক এক জায়গায় তো পাঠালে মেয়েকে।

বাবা মার দিকে তাকালো। মা'র তুটি ভ্রুর মাঝে ধিক্কারের একটি তীক্ষ্ণ খোঁচা ফুটে উঠলো। মুখ ফিরিয়ে চলে গেল সামনে থেকে।

বাবা চুপ করে রইলো।

আশা তার জিনিষ-পত্র গোছাতে লাগলো কারণ আজ বিকেলেই তাকে চলে যেতে হবে। আজ রবিবার, বাবা তাকে পৌঁছে দিয়ে আসবে।

শ্যাম বললো, দিদি, তুই খালি আসিসনে। আমরাও যাব, আমাদের বেশ বেড়ানো হবে।

আশা বললো, আচ্ছা।

রাম বললো, আর যখন আসবি, তখন তোর কাছে অনেক পয়সা থাকবে, না?

আশা হেসে বললো, কেন?

রাম বললো, তা হলে খাবার আনবি।

আশা কাঁচকলা দেখিয়ে ভেংচালো রামকে, তারপর হাসলো, কিন্তু মুখ ফিরিয়ে নিল রামের দিক থেকে। বাবা বুঝি কখন মায়ের কাছে চলে গেছে। আশা শুনতে পেল মায়ের ঝঙ্কার, তুমি যাও তো এখন আমার কাছ থেকে, আমার ভাল লাগছে না তোমার কথা শুনতে।

আশার কাজের হাত থেমে এল, মায়ের গলায় যত ঝাঁজ, তত ভেজা ভেজা শোনাচ্ছে। আশা জানে, মা কী চেয়েছিল। আশা জানে, মা তার সঙ্গে আজ আর চোখাচোখিও করবে না। কারণ স্বামী পুত্র কন্যা কারুর সামনেই মা কোনোদিন চোখের জল ফেলতে ভালবাসে না।

আশা সুটকেস গুছিয়ে বেণী খুলতে খুলতে রাংচিতের বেড়ার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। আকাশ নীলে সাদায় মাখামাখি। এ সময়টায়, একটিও প্রজাপতি নেই। কিন্তু কৃষ্ণকলি প্রচুর, মেজেণ্টা রং-এর ফুলগুলি রোদের ঘায়ে মূর্ছা গেছে। ছায়ায় আবার ফুটবে। উঠানে এখনো বর্ষার সবুজ শ্যাওলার দাগ।

আশা তাড়াতাড়ি মাথায় তেল দিয়ে বললো, মা নাইতে যাচ্ছি।

নদীতে গেল আশা, আজ শেষ, আবার কবে আসবে, কে জানে।

বড় রাস্তার ওপরে পা দিয়ে আশা হেসে ফেললো। মনে মনে বললো, আজকের দিনটার জন্যই বোধহয় তখন চমকেছিলাম।

সতীতলার দিকে ফিরবে না মনে করেও একবার ফিরতে হয়। এ বট যেন অক্ষয়, অমর। শুধু মন্দিরটাই যেন সময়ের পায়ে আর একটু মাথা নুইয়েছে। সতীতলার পাখিগুলিও বংশ পরম্পরায় বাস করে কিনা কে জানে। নাকি, ওরা নদীর ঘাটে যাবার সময় সব মানুষের দিকে অমন ঘাড় কাৎ করে তাকায়।

নদীতে এখন অনেক জল, ওপরের ধান ক্ষেতে সবুজের গায়ে পাঁশুটে ছোপ লেগেছে। চান করে ফেরবার সময় সতীতলার দিকে আজ আবার তাকালো না আশা।

বাড়ি এসে কাপড় ছাড়ার পর রাম বললো, দিদি, মা তোকে বেড়ে য়া
নিয়ে খেতে বলেছে।

আজ মা আর আশার সামনে আসবে না, সে জানে। কিন্তু আশার বড় ইচ্ছে করলো, আজ ও মা'র কাছে বসে খাবে। বাবা আর ভাই-য়েদের খাওয়া হয়ে গেছে। আশা আর মা খাবে, তারপর অনেকক্ষণ-এঁটো হাতে কথা বলবে, ভেবে আশা চুল আঁচড়াতে যাচ্ছিল।

এমন সময় দরজায় ডাক শোনা গেল, হরেনদা।

আশা থমকে দাঁড়ালো ঘরের মধ্যে।

বাবা বারান্দায় ছিল বললো, কে?

—আমি।

বাবা বলল, ফটিক নাকি? এস, কী খবর?

চিরুনির তীক্ষ্ণ দাঁত আশার আঙুলে চেপে বসলো। মনে হল, এক অদৃশ্য বাতাস ঝাপটা দিয়ে গেল ওকে। নিজেকে সামলে শক্ত হল সে। দেখলো, ফটিকদা বারান্দায় বাবার কাছে এল। এখনো বোধ হয় চান করেনি, তাই রুক্ষু, খাওয়া হয়নি, তাই শুকনো। গলার স্বরটা অনেকদিন বাদে বেশী মোটা লাগছে। বললো, এই অনেকদিন আসব আসব ভাবছি, আসা আর হয় না। খাওয়া হয়ে গেছে নাকি?

বাবা বললো, হ্যাঁ !

আশা পা টিপে টিপে সরে যেতে চাইলো, পারলো না, একই জায়গায়, প্রাক-ঝড় স্তব্ধতায় সে প্রস্তরবৎ। সে দেখল, ফটিকদাকে ঠিক সেই রকম বোকা বোকা দেখাচ্ছে, বললো, বউদি কোথায় ?

বাবা বললো, চান করতে গেছে।

ফটিকদা এদিক ওদিক তাকালো, বললো, আশা নাকি চাকরী করতে চলে যাচ্ছে শুনলাম।

বাবা বললে, হ্যাঁ।

এমন সময়ে মা এসে দাঁড়ালো। ফটিকদা বললো, এই যে বউদি, আমি একটু এলাম।

মা বললো, বস।

কিন্তু ফটিকদা বললো, বসব না। আপনারা দুজনেই রয়েছেন, একটা কথা বলব।

বাবা মা দুজনেই চুপচাপ।

ফটিকদা সারা গায়ে একটা দোলানি দিয়ে একবার হাসলো, আবার গম্ভীর হল। বললো, আশাকে আমার সঙ্গে বে দিতে আপনাদের আপত্তি আছে ?

আশার মনে হল, থরথরিয়ে কেঁপে বুঝি মেঝেয় লুটিয়ে পড়বে। শ্বাস রুদ্ধ হয়ে যাবে। চোখের দৃষ্টি অন্ধ হয়ে যাবে।

কিন্তু কিছুই হল না। শুধু তার নিশ্বাস সহজ হয়ে পড়লো না। বুকের মধ্যে কে যেন তাকে চাপা দিতে চাইলো বারে বারে, দৃষ্টি তার স্বচ্ছ রইলো, কিন্তু দিক্‌ভ্রান্ত হল।

বাবা যেন হুড়মুড় করে কি বলতে যাচ্ছিল, মা বলে উঠলো, দেখ, নিজেরা বে দিতে পারিনি, ভরণপোষণের জন্য তাই মেয়েকে চাকরী খুঁজে নিতে হয়েছে, এখন মেয়ে যা বলে, তাই।

উঃ। মা কী সাংঘাতিক মেয়ে, সত্যের কাছে মা'র কোনো সংস্কার নেই ? নইলে এমন করে মেয়েকে কখনো এমন বিষয়ের মুখোমুখি

দাঁড়াতে দেয়? বাস্তবের সামনে মেয়ের সব লজ্জাকে এমনি করে ঘুচিয়ে দিল মা। কী করবে সে?

সে শুনতে পেল ফটিকদার গলা, ও কোথায়?

— ঘরে।

—যাব?

—যাও।

কেমন করে আশে ফটিকদা? মা বাবা না বসে বাইরে? এমন দিনও আসে সংসারে, যখন আর কোনো অন্তরাল কোথাও থাকে না।

ফটিকদার ছায়াটা দেখতে পেল আশা। সে চোখ তুললো। আশার কানে কানে যেন কে বললো, এইজন্যে, এই জন্যেই সেদিন বুঝি চমকেছিলাম, ফটিকদার এমনি করে ছুটে আশা, এই চেহারা দেখব বলে?

ফটিকদার দিকে তাকিয়ে ওর চোখ বুজে এল, কাঁদবে না মনে করেও, তাকে রোধ করা গেল না। কিন্তু অশান্ত হল না আশা। ব্যাকুল হল না, ফোঁপাল না। ঘরের কোণে সরে গেল ও।

ফঠিক কাছে এল, বোঝা গেল, তার গলার স্বর ফুটছে না। থেমে থেমে বললো, চাকরী নিয়ে নাকি চলে যেতে চাস?

আজ ফটিকদা 'তুমি' বলে একটু ভনিতাও করল না।

আশা বলল, হ্যাঁ।

—কেন?

আশা হাসতে চাইলো। বললো, কেন আবার কি? দিন কি একরকম যায়! খেয়ে পরে বাঁচতে হবে তো আমাকে।

ফটিকদার নিশ্বাস লাগল আশার গায়ে। বললো, তা হলে আমি কি করব?

আশা তাকালো ফটিকদার দিকে, কিন্তু সেই পুরনো দিনের মত াস ভাসিয়ে নিয়ে গেল না আশাকে, কোনো অভিমানের বাষ্প

তাকে আবেগে কাঁপিয়ে দিল না। দেখলো একদিন যে-নদীর কূলে বর্ষায় প্লাবিত হয়েছিল, সামান্য বাতাসে ও দোলায় যা চল্‌কে উঠেছে, ছলছলিয়েছে, আজ সেই জল নেমে গেছে। কঠিন ধূলি ধূসর পাড় জেগেছে সেখানে, প্লাবন যখন হয়েছিল, তখনো ভবিষ্যৎ সময়ের বুকে ইশারা ছিল, একদিন এপাড় জাগবে। সে উত্তরঙ্গ উচ্ছ্বাস থাকবে না। কিন্তু নদীটি থাকবে, স্রোত থাকবে, গহীনও থাকবে। আছেও। তাই নিজের হাতে চোখের জল মুছে আশা স্নিগ্ধ চোখে তাকালো ফটিকদার দিকে, বললো, আমাকে কি করতে বলছ বল?

ফটিকদার গলায় বুঝি আর স্বর ফুটতে চায় না, বললো, তোর সঙ্গে আমার যে-কথা ছিল?

মনে আসে সেকথা, সংসার করার কথা। জবাবে অনেক কথা মনে এল আশার কিন্তু কি লাভ সে কথা বলে। আশা তো জানে, রাগে ফুলেছে ফটিকদা আশার স্ব-ইচ্ছায় কাজ করার জন্যে। তাতে নিজেই অনেক দুঃখে ভুগেছে, অনেক সন্দেহে ও সংশয়ে কষ্ট পেয়েছে। তারপর, শোধ তুলতে গিয়ে, সুখের ভান করে, নিজেকেই মেরেছে নিষ্টে পিষ্টে, সে বিদ্রুপ করে লাভ কী? কারণ, আশার ভিতরের জটিল সর্পিল গতি সেই নদী তো কোনোদিন মজে নি। সে চির-প্রবাহমান।

আশা বললো, কাজে যেতে চাই। ওটুকু নিয়েছি নাকি?

ফটিক আশার হাত ধরে বললো, তবে? চলে যেতে চাস্ যে?

আশা বললো, কাজে যেতে চাই। ওটুকু আমাকে যেতে দিও ফটিকদা।

বলতে বলতে আশার গলা চেপে এল। একটু পরে পরিষ্কার গলায় বললো, তুমি সব নিও, নিজের জন্য শুধু আমি ওই দায়টুকু নিলাম। নইলে আমাকে কবে একদিন তোমার খাটো মনে হবে তখন আমার কষ্ট হবে।

ফটিকদা কয়েক মুহূর্ত অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো, শান্ত স্থির,

কিন্তু এত খর বুঝি কোনদিন মনে হয়নি আশাকে। চেনা জানাও ছিল না, কেন? তার কারণ কি? আশা এমনিই তো ছিল।

ফটিক আরো শক্ত করে আশার হাত ধরে বললো, কখন আসবি আবার?

আশা বললো, ছুটি পেলেই আসব। আর তুমি যখন ডাকবে, তখনই আসব।

ফটিকদার বিস্ময়ে ও বিচিত্র ব্যথায় সহসা কথা সরতে চায় না যেন। বললো, আজ আমি তাহলে তোকে চাকরীর ওখানে রেখে আসব আশা।

আশা ঘাড় কাৎ করে বলল, আচ্ছা। কিন্তু ফটিকদা—

কি?

—রাগ করলে না তো?

ফটিক বললো, না। কিন্তু তোকে না দেখে কষ্ট হবে। তবে সে তো দুজনেরই।

বলেই ফটিকদা কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করলো। তারপরই রুদ্ধ গলায় বললো, আমি ঘুরে আসি।

চলে গেল ফটিকদা। সেদিকে তাকিয়ে সহসা আশারও গলার কাছে যেন কিছু ঠেলে এল হু হু করে। ট্রাঙ্কের ওপর মুখ চেপে বসলো সে।

একটু পরেই আশা মায়ের ডাক শুনতে পেল, খুকী।

মুখ না ফিরিয়ে আশা বললো, উঁ?

—ভাত বেড়েছি, খেতে আয়।

মা চলে গেল।

চোখ মুছল আশা। মানুষ মনে মনে বারে বারে চমকায়। সে চমকটা ওপরের ঝলকানি। আসলে সেটা নিরন্তর জীবনের বাঁকে বাঁকে দূর-দুন্দুভির শব্দের দোলা।

আশা বাইরে বেরিয়ে এলো।

দুই

প্রিয়লাল মুস্তফির বাড়িতে যেন আনন্দের ঝড় বইতে লাগলো। বস্তুত এ আনন্দের ঝড়ের সূচনা করেছিল মহীতোষের চিঠি পাবার দিন থেকেই। এক মাস আগে মহীতোষ, তারিখ দিন ক্ষণ জানিয়ে, হামবুর্গ থেকে, বাবা প্রিয়লালকে চিঠি লিখেছিল, ও কলকাতায় আসছে। সেই চিঠিতেই মহীতোষ ওর ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের সংবাদটাও জানিয়েছিল। লিখেছিল, "ভেবে দেখলুম, মানব জন্ম সত্যি দুর্লভ। কথাটা একদিন তোমার মুখ থেকেই শুনেছিলুম: তখন মনে মনে সত্যি হেসেছিলুম। বিশ্বে কয়েকশো কোটি মানুষ যদি সত্যি ভাবতে আরম্ভ করে, মানব জন্ম দুর্লভ, তা হলে তো সেটা একটা সমস্যা। আর মানব জন্ম যদি দুর্লভই জ্ঞান করি, তার জন্যে বিয়ে করাটা কোনো অনিবার্য বিষয় নয়। তোমাদের—অর্থাৎ তোমার, মায়ের, অন্তু আর নীতুর মনে নানা রকম সন্দেহও ছিল, দীর্ঘকাল বিলেতে বাস করে আমি বোধহয় কোনো শ্বেতাঙ্গিনীর প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছি। কথাটা লিখলুম, কারণ তোমার আর মায়ের কোনো কোনো চিঠিতে সে-আভাস ছিল। সে-রকম ঘটলে তোমাদের জানাতুম নিশ্চয়ই। তোমরা আমাকে সে-রকম শিক্ষা দাওনি। আসলে এতকাল আমার বোধহয় সাহসের অভাব ছিল। আর সেটার কারণও বোধহয় এই প্রবাসী জীবনযাপন। ভুলেই গিয়েছিলুম, আমাদের সমাজ পরিবার বিয়ে ব্যাপারটার সঙ্গে এদেশের কোনো মিল নেই। জর্মনদের ওপর আমার কোনো বিদ্বেষ নেই। কিন্তু এদের দাম্পত্য জীবন—বিশেষ করে এই জেনারেশনের যা চেহারা দেখছি, তাতে বীতশ্রদ্ধ বোধ করছি। আমার মনের সেই বীতশ্রদ্ধ ভাবটাই আমার সাহসের অভাব কিনা জানিনে। অথচ অন্তু আমার ছোট ভাই হয়েও, অনায়াসেই প্রেম করে সুনীতাকে বিয়ে করে নিয়ে এলো। যাই হোক,

অনেক আজে বাজে কথা লিখে ফেললুম। এবার আসল কথাটা বলে ফেলি। আমি মন স্থির করে ফেলেছি, বিয়ে করবো। যদিও চল্লিশ বছর পার করে দিয়েছি। তোমার মা'র অনেক অনুরোধ উপরোধ সত্ত্বেও, প্রত্যাখ্যান করেছি। তোমাদের মনে কষ্ট দিয়েছি। তোমরা আমার বিয়ের আশা ছেড়েই দিয়েছো। অনেক মেয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ করেছো। কলকাতায় গেলে অনেক মেয়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছো, ফটো দেখিয়েছো। উদ্দেশ্য গোপন করো নি। আমি এতকাল বাধা দিয়ে এসেছি। এবার স্থির করেছি, বিয়ে করবো। আমি দুমাসের ছুটি নিয়ে যাচ্ছি। তোমরা প্রস্তুত হও। শুধু একটা অনুরোধ, যে-মেয়ের সঙ্গেই সম্বন্ধ কর, তার সঙ্গে আগে আমাকে আলাপ করিয়ে দিও। বুঝতেই পারছো, বয়স হয়ে গিয়েছে। যে-মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে হবে, সে যেন কোনো ক্রমেই নিজেকে বঞ্চিত না ভাবে, সে যেন আমাকে বুঝতে পারে, আমিও যেন তাকে খানিকটা বুঝতে পারি, যাকে বলে পরস্পরের মধ্যে একটা আণ্ডারস্ট্যাণ্ডিং হয়, সেই জন্যই তার সঙ্গে আমার আলাপ পরিচয় কথাবার্তা হওয়া উচিত। রূপের কথা তুলবো না, কিন্তু বয়স যেন তিরিশের কম না হয়।

বাবা, তোমার মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, হঠাৎ আমি কেন এ সিদ্ধান্ত নিলুম। হ্যাঁ, হঠাৎই এ সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এখানে আমার সহকর্মী ছিল একটি বাংলাদেশের ছেলে। নাম জাহাঙ্গীর। আমার থেকে বয়সে অনেক ছোট। ভারি সুন্দর ছেলে, খাঁটি বাঙালী। জাহাঙ্গীর ছিল অত্যন্ত হাসি খুশি, দেখলেই মনে হতো একটি তরতাজা ফুলের মতো ছেলে। বিয়ে করে নি। কিন্তু বিয়ের কথাবার্তা সব পাকা হয়ে গিয়েছিল। যার সঙ্গে বিয়ে হবার কথা ছিল, সে-মেয়েটি ওর চেনা। মেয়েটি থাকে ঢাকায়। নাম আয়েশা। জাহাঙ্গীর রোজ একবার করে আমাকে ওর আয়েশার কথা শোনাতো। আয়েশাকে বিয়ে করে নিয়ে আসবে, সেই সুখী জীবনের স্বপ্ন দেখতো ও। আমাকে বলতো। আমাকে মহীদা বলে ডাকতো। নেশা ভাঙ্ কিছুই

করতো না, ধূমপান ছাড়া। এখানে মেয়েদের সঙ্গে ওকে কখনও তেমন মেলা মেশা করতে দেখিনি। ও আয়েশার স্বপ্নেই ভোর হয়েছিল। হঠাৎ সেই জাহাঙ্গীর সেরিব্রাল থ্রম্বোসিস্ হয়ে মারা গেল। মৃত্যুর আগে জাহাঙ্গীর আমাকে একটা কথাই মাত্র বলেছিল, 'মহীদা, জীবনটা বড় ছোট।" জাহাঙ্গীর আমার চোখের সামনে থেকে, আমার বুকের অন্ধকার থেকে যেন একটা কালো পর্দা সরিয়ে দিয়ে গেল। জীবনকে আমি নতুন চোখে দেখলাম। অথচ এ কথাটা আগেও অনেকবার অনেকরকম করে শুনেছি। কিন্তু অনিবার্য মৃত্যুর গ্রাসে যে চলে যাচ্ছে, এমন মানুষের মুখ থেকে কখনও শুনিনি। সেইজন্যেই বোধহয় কথাটা আমার জীবনে নতুন অর্থ বহন করে নিয়ে এসেছে। জাহাঙ্গীরের শেষ কথার মধ্যেই, তোমার সেই কথাটারই প্রতিধ্বনি যেন শুনতে পেলাম, মানব জন্ম দুর্লভ। তখনই সিদ্ধান্ত নিলাম, আমি বিয়ে করবো। মানুষের চিরকালের প্রার্থনা তো পূর্ণতা। বিয়ে সেই পূর্ণতারই একটি অংশ, জাহাঙ্গীর আমাকে সেটাও বুঝিয়ে দিয়ে গিয়েছে···।"

মহীতোষের রোজনামচা ঃ

১৭ ডিসেম্বর ঃ এয়ারইণ্ডিয়ার বোয়িং বিমান উড়ে চলেছে অনেক ওপর দিয়ে। আর ঘণ্টা তিনেক পরেই দমদম এয়ারপোর্টে পৌঁছে যাবো। আশা করছি বাড়ির সবাইকেই সেখানে দেখতে পাবো। আমাদের সংসার তেমন বড় নয়। বাবা, মা, ছোট ভাই অন্তু, অন্তুর স্ত্রী সুনীতা আর একমাত্র বোন নীতু। ওর এখনও বিয়ে হয়নি।

মাসখানেক আগে বাবাকে যে-চিঠি লিখেছিলুম, তার জবাবও পেয়ে গিয়েছি। বেশ অনুমান করতে পারছি, আমার বিয়ের সিদ্ধান্তের কথা জানানোর চিঠি পেয়েই বাড়িতে একটা উৎসবের সাড়া পড়ে গিয়েছে। স্বাভাবিক। আমার এখন চুয়াল্লিশ বছর বয়স চলছে।

এঞ্জিনিয়ারিং পাশ করেছিলুম ভালো ভাবে। কিছুকাল কলকাতায় একটা চাকরি করেছিলুম বছর দুয়েকের জন্য। মাইনে পেতুম সামান্য। বাবা একজন জাঁদরেল আইনজীবী। এখন আর তাঁর জীবিকা এ্যাডভোকেটের নয়। হাইকোর্টের একজন জাজ। এঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে প্রথম চাকরি পাবার পরেই মা আমার বিয়ের কথা তুলেছিলেন। আমি তো আপত্তি করেছিলুমই, বাবাও আপত্তি করেছিলেন আমার বয়স আর অর্থোপার্জনের কথা ভেবে। তিনি ভেবেছিলেন, আমি চাকরিতে আরও উন্নতি করলে বিয়ে দেবেন। দু বছর চাকরির পরে, আমি যখন হামবুর্গে চাকরি নিয়ে চলে যাই. বাবা তখনই আমার বিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। আমি নানান অছিলায় বিয়ে করিনি।

বিয়ে না করার কারণ আমাদের পরিবারে বরাবর অজ্ঞাত থেকে গিয়েছে। আমি একটি মেয়েকে ভালবাসতুম। যাকে বলে প্রেমে পড়া, তাই ঘটেছিল আমার জীবনে। কিন্তু জীবন বড় বিচিত্র। আমি প্রেমে পড়েছিলুম আমার এক বন্ধুপত্নীর সঙ্গে। যদি কোনো অবিবাহিতা মেয়ের সঙ্গে প্রেম হতো, তা হলে এতো কালে আমার বিয়ে হয়ে যেতো। ছেলেমেয়েও নিশ্চয়ই হতো। তা হয়নি। আমার বন্ধু হীরক, এক সঙ্গেই আমার সঙ্গে এঞ্জিনিয়ারিং পাশ করেছিল। পুরো নাম হীরক কুণ্ডু। ওদের আদি নিবাস ছিল যশোহরে। বৈষ্ণব পরিবার, পেশায় আত্যন্তিক ব্যবসায়ী। পরিবারটিকে ঠিক রক্ষণশীল বলা চলে না। কিন্তু ছেলেমেয়েদের বিয়ে অল্প বয়সেই হতো। হীরক এঞ্জিনিয়ারিং পাশ করার তিন মাসের মধ্যে ওর বিয়ে হয়েছিল। অর্থোপার্জনের জন্য ছেলের বিয়ে ওদের পরিবারে আটকায় না। ছেলে এঞ্জিনিয়ারিং পাশ করেছে, সেটাই যথেষ্ট। অর্থের অভাব ছিল না। ছেলে কবে চাকরি কিংবা ব্যবসা করবে, তার জন্যে বিয়ে মুলতুবি রাখার কোনো প্রশ্নই ছিল না। ওর বিয়ে হয়েছিল এক পাঁচ পুরুষের অবাঙালী শেঠ পরিবারে। ওর শ্বশুরবাড়ির লোকেরা পুরোমাত্রায়

বাঙালী হয়ে গিয়েছিল। ব্যবসায়ী পরিবার বটে, কিন্তু শেঠ পরিবারটি ছিল শিক্ষিত, উদার। যথার্থ আধুনিকতা বলতে যা বোঝায়, পরিবারে ছিল সেই আবহাওয়া। বাঙালী সংস্কৃতির সঙ্গে গড়ে উঠেছিল অচ্ছেদ্য সম্পর্ক। শিক্ষা সঙ্গীত শিল্প চর্চা সবই ছিল সেই পরিবারে। সেই পরিবারের মেয়ে চন্দ্রা তখন সবে মাত্র ইংরেজিতে অনার্স নিয়ে বি. এ. পাশ করে কলকাতায় য়ুনিভারসিটিতে ভরতি হয়েছিল। বিয়ে হয়ে গেল হীরকের সঙ্গে। হীরকদের বাড়ি থেকে বলা হয়েছিল, পুত্রবধূকে তার পড়া চালিয়ে যেতে দেওয়া হবে। চন্দ্রারও বিয়েতে সম্মতি দেবার এই একটাই শর্ত ছিল।

হীরকদের বাড়ির কোনো বউ কখনও কলেজে য়ুনিভার্সিটিতে পড়েনি। হীরকের মা চন্দ্রার য়ুনিভারসিটিতে পড়তে যাওয়ার আপত্তি তুলেছিলেন। সে-আপত্তি টেঁকেনি। হীরকের বাবার পূর্ণ সম্মতি ছিল। হীরকও মোটে আপত্তি করেনি। আমি হীরকের বিয়েতে বর-যাত্রী গিয়েছিলুম। সন্ধ্যালগ্নে বিয়ের পরে, আমি হীরকের বাসর ঘরে গিয়েছিলুম। একলা না, গিয়েছিলুম কয়েকজন বন্ধু এক সঙ্গে মিলেই। ছাঁদনাতলায় অন্যান্য ক্রিয়া কাণ্ড দেখিনি। চন্দ্রা ঘোমটায় মুখ ঢেকে বসেছিল না। সেই ওকে আমার প্রথম দেখা। ওরও। কনের বেশে ওকে খুবই সুন্দরী দেখাচ্ছিল। এমনিতেও চন্দ্রা সুন্দরীই।

আমি নাস্তিক মানুষ। দেবদ্বিজে ভক্তি ছিল না। অতএব অলৌকিকতায় আমার বিশ্বাস নেই। কিন্তু আমি জীবন রহস্যে বিশ্বাসী। জীবনের কোনো ছক নেই। আমাদের মনগড়া বিশ্বাস, সৌন্দর্যবোধ ইত্যাদি ব্যাপারগুলোতেও আমার কোনো বিশ্বাস নেই। কেন না, সেই সব বিশ্বাসের সঙ্গে আমাদের জীবনযাত্রার কোনো [illegible] নেই। হীরকের বাসর ঘরে, প্রথম যখন চন্দ্রার সঙ্গে আমার দৃষ্টিবি[illegible] হয়েছিল, সেই মুহূর্তে কি অলক্ষ্যে থেকে কেউ হেসেছিল?

চন্দ্রার মুখে ছিল সলজ্জ শালীন হাসি। হীরক আমাদের স[illegible] চন্দ্রার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল। এক বন্ধু বাধা দিয়ে বলেছিল, পরি[illegible]

র্বটা এখানেই সেরে ফেলছিস্ কেন হীরক। ওটা তোর বাড়িতে বৌভাতের দিনে হবে। নাকি বৌভাতে আমাদের ফাঁকি দিবি? হীরক বলেছিল, তা কেন? তোরা সামনে রয়েছিস্, তাই পরিচয় করিয়ে দিলুম। চন্দ্রার বোন ও বান্ধবীরাও ছিল। চন্দ্রা তাদের সঙ্গেও আমাদেব পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল।

সেই বাসর ঘরে দেখার পরে, বৌভাতের দিন আবার দেখেছিলুম। কিন্তু আমি চন্দ্রার সম্পর্কে কিছুই ভাবিনি। বন্ধুর স্ত্রী, এই পর্যন্ত। আমার তখন অল্প আয়। ভালো কিছু উপহার দেবার মতো সঙ্গতি ছিল না। আমার একটি প্রিয় বই, টমাস মানের হোলি সিনার। বইটি দুজনের নামে লিখে দিয়েছিলুন। 'হোলি সিনার' আমার প্রিয় এই অর্থে নয় যে উপন্যাসটিতে ঐশ্বরিক ভাবনা আছে। জীবন যে আমাদের বাস্তবতা বোধ থেকে কতো অপ্রাকৃত হতে পারে, এবং মানুষের পাপ ও আত্মত্যাগের গভীরতা কোন্ পর্যায়ে যেতে পারে, হোলি সিনার আমাকে সেই বোধ দিয়েছিল।

তারপরে তো সবই ভুলে গিয়েছিলুম। হীরক চন্দ্রাকে নিয়ে কাশ্মীর না কোথায় গিয়েছিল, খেয়াল নেই। আমি আমার চাকরি, আড্ডা ইত্যাদি নিয়ে দিন কাটাচ্ছিলুন। বেশির ভাগ দিনই, ছুটির পরে সেন্ট্রাল অ্যাভিন্যুর কফি হাউসে যেতুম। বন্ধুরাও আসতো সেখানে। এমন কোনো বিষয় ছিল না, যা আমাদের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত ছিল না। কিন্তু আমার মনে থাকতো একটা কথা। জীবনে উন্নতি।

কফি হাউসে একদিন হীরক এলো। বিয়ের প্রায় দু মাস পরে সঙ্গে দেখা। বন্ধুরা খুব হৈ চৈ করলো। হীরকের পকেট খসানো হলো ভালো ভাবেই। কফি হাউস থেকে বেরিয়ে হীরক আমাকে বললো, 'চন্দ্রা তোকে যেতে বলেছে।' আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, 'হঠাৎ?' হীরক একটু মুচকি হেসে বলেছিল, 'কী জানি। এখনই বাড়ি গিয়ে কী করবি? চল্, আমাদের বাড়ি ঘুরে যাবি।

বলতে গেলে দক্ষিণ কলকাতায় আমরা একই পাড়ার অধিবাসী।

এক কিলোমিটার দূরত্ব ওদের বাড়ি, আর আমাদের বাড়িতে। তা ছাড়া হীরকদের ব্যবসায়ের আইন উপদেষ্টা, মামলা মোকদ্দমার দায়িত্ব ছিল আমার বাবার। ওর বাবা প্রায়ই আমাদের বাড়ি আসতেন। আমিও মাঝে মাঝে ওদের বাড়ি যেতুম। আমি হীরকের সঙ্গে ওদের বাড়ি গিয়েছিলুম। বিরাট ওদের বাড়ি, বাগান। হীরকের জন্য দোতলায় নির্দিষ্ট হয়েছিল নতুন ঘর। সামনে দক্ষিণ খোলা বড় ব্যালকনি। ঘরের সঙ্গে সংলগ্ন বাথরুম। ঘরটি সাজানো হয়েছিল সুন্দর। ঘন বুনটের সরু আর মিহি চটের ওপর রঙ করা পর্দা। বড় ঘরের মাঝখানে ওদের ক্যাবিনেট করা খাটের ওপর পরিষ্কার বিছানা। ড্রেসিংটেবল, ওয়ারড্রব, স্টিলের আলমারি আর ওয়ারড্রব, সব সাদা সত্ত্বেও, বড় ঘরটাকে মোটেই জবরজং দেখাচ্ছিল না। এক পাশে দুটি সিঙ্গল শোফা আর সেন্টার টেবল। পাশেই আর একটি ছোট ঘর। চন্দ্রার পড়ার ঘর। একটি টেবিল একটি চেয়ার ছাড়া রয়েছে দুটি আলমারি ঠাসা বই।

চন্দ্রাকে দেখেছিলুম নতুন বেশে। একেবারেই আটপৌরে। প্রস্তুতও ছিল না, বাইরের কেউ আসতে পারে ভেবে। পরে আরও অনেকবার গিয়ে দেখেছি, ওর বেশভুষা খুবই সামান্য। ঠোঁটে রঙ, চোখে কাজল, সন্না দিয়ে ভুরু সরু করা, কখনও দেখিনি। ভুরু জোড়া ওর সরুই ছিল। একহাতে সোনা দিয়ে বাঁধানো একটি লোহা, আর এক হাতে একটি সোনার বালা। ঘোমটা ছিল না মাথায়। সিঁথিতে সিঁদুরের রেখা। স্বাস্থ্যের দীপ্তিতে লাবণ্যময়ী। রঙ ফরসা। টিকলো নাক। চোখ দুটি ডাগর কালো, দৃষ্টি গভীর, এবং ভুল দেখেছিলুম কি না জানিনে। মুখের হাসির কিরণের মধ্যেও, চোখের গভীরে যেন একটা বিষণ্ণতা। হীরক বলেছিল, তুমি বলেছিলে, মহীতোষকে ডেকে আনতে। এনেছি।'

চন্দ্রা কেতা মাফিক আমাকে নমস্কার করেনি। শোফা দেখিয়ে বলেছিল, 'বসুন', হীরুকে বলেছিল, 'ওঁকে ডেকে আনবার দরকার হলো কেন? তোমার মুখে তো শুনেছি, উনি তোমাদের বাড়িতে প্রায়ই আসেন। সেটা কি হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেছে?'

হীরক বলেছিল, 'সেইরকমই তো দেখছি। ও আজকাল আর আসছে না। তাই কফি হাউসে আমাদের পুরনো আড্ডা থেকে ওকে ধরে নিয়ে এলুম।' চন্দ্রা আমার দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়েছিল। আমি হেসে বলেছিলুম, 'হীরক সবে বিয়ে করেছে। ওর নতুন দাম্পত্য জীবনে কোনো বাধা সৃষ্টি করতে চাইনি।

চন্দ্রা অবাক হেসে বলেছিল, 'নতুন দাম্পত্য জীবন থেকে বন্ধুরা বিদায় নেবে, সে আবার কেমন কথা। দাম্পত্য জীবনের সঙ্গে, বন্ধু-বান্ধবদের ত্যাগ করার কোনো প্রশ্ন নেই।' চন্দ্রা হীরকের দিকে তাকিয়েছিল। হীরক বলেছিল, 'আমি মোটেই সেরকম ভাবিনে। তবে হ্যাঁ এটা বলতে পারো, আমি এখন তোমাকে নিয়ে মসগুল হয়ে আছি।' আমি হীরক দুজনেই হেসে উঠেছিলুম। চন্দ্রা হেসে ওর পড়ার ঘরে গিয়েছিল। হাতে করে নিয়ে এসেছিল দুখানা বই। একই বই। একটির মলাট কিছু পুরনো বিবর্ণ। আর একটি বেশ ঝকঝকে। চন্দ্রা ঝকঝকে বইটি আগে আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়েছিল। দেখেছিলুম বিয়েতে উপহার দেওয়া আমারই বই 'হোলি সিনার।' দ্বিতীয় বইটির পাতা খুলে বাড়িয়ে দিয়েছিল। দেখলাম, সেখানে ইংরেজিতে লেখা আছে, 'চন্দ্রা শেঠ।' তার নীচে লেখা আছে, 'আমার অত্যন্ত প্রিয় উপন্যাস।' তারিখ লেখা রয়েছে, বছর খানেক আগের। আমি অবাক চোখে চন্দ্রার দিকে তাকিয়েছিলুম। চন্দ্রা হেসে বলেছিল, 'বইটা পেয়ে মনে হয়েছিল, যেন আপনি জেনেশুনেই বইটি আমাদের উপহার দিয়েছেন।' আমি উল্টো বুঝে আফশোস্ করে বলেছিলুম, 'আপনার পড়া বইটাই আমি দিয়েছি? আগে জানতে পারলে, অন্য বই দিতুম।' চন্দ্রা মাথা নেড়ে বলেছিল 'আমি মোটেই সে-কথা বলতে চাইনি। তা হলে আর আমার বইটা আপনাকে দেখালুম কেন? আমার বইয়ে কী লেখা আছে, দেখলেন তো। বইটা পেয়ে তাই আমার খুব ভালো লেগেছিল। একই বই নিজের কেনা, আর তারপরে আর একজনের কাছ থেকে পাওয়া, অবাক করেছিল আমাকে। এ বইটা কি আপনারও প্রিয় নাকি?' বলে-

ছিলুম, 'খুবই।' সেই মুহূর্তে চন্দ্রা আমার চোখের দিকে তাকিয়েছিল। আমিও। কেমন যেন মনে হয়েছিল, একটা উদ্গত দীর্ঘশ্বাস ও চেপে-ছিল। বলেছিল, 'আপনার আফশোসের কিছু নেই। এ বই দু কপি থাকলে ক্ষতি নেই।'

হীরক বই দুটো নেড়েচেড়ে দেখে বলেছিল, আমি তো এ বইয়ের পাতা উলটেই কোনো দিন দেখিনি। মহীতোষের খুব গল্প উপন্যাস পড়ার বাতিক আছে। আমি আবার সাহিত্যের ধারে কাছে নেই। আজ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রই পড়ে উঠতে পারলুম না। যা পড়েছি সেই স্কুল পাঠ্য বই থেকে'। হীরক যখন কথাগুলো বলছিল, চন্দ্রা আমার দিকে তাকিয়েছিল। ওর মুখে ছিল হাসি, চোখে বিষণ্ণতা। হীরকের হাত থেকে বই দুটো নিয়ে বলেছিল, 'সংসারে সব কিছু সকলের জন্য নয়। তা না হলে আর স্বাতন্ত্র্য বজায় থাকে কী করে। তবে কথা হলো ওটা বাতিক নয়, মানসিকতা। বাতিকগ্রস্ত পাঠকদের জন্য অনেক আলাদা বই আছে। তারা সে-সব গোগ্রাসে গেলে। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসই বা কজন পড়ে? হালের লেখকদের মধ্যে যাঁরা একটু আলাদা, ভাবনা চিন্তা করার মতো লেখা লেখেন, তাঁদের বইও খুব বেশি লোকে পড়ে না। যাকগে এসব কথা। আপনি কী খাবেন বলুন।'

আমি ব্যস্ত হয়ে বলেছিলাম, 'এখন কিছুই খাবো না। হীরক আজ আমাদের প্রচুর খাইয়েছে। আর একদিন এসে খাবো।' সেই সময়ে হীরকের মা এসেছিলেন। চন্দ্রা ছোট করে একটু ঘোমটা টেনেছিল। হীরকের মা আমাকে বলেছিলেন, 'মহীতোষের যে আর পাত্তাই নেই হীরুর বিয়ের পরে এই প্রথম এলে।' তিনিও আমাকে কিছু খেতে বলেছিলেন। জবাব সেই একই দিয়েছিলাম। চলে আসবার আগে তিনি বলেছিলেন, 'আমাদের হীরুর জন্য একটা চাকরি বাকরি দেখ। বন্ধুকে বেকার করে রেখো না।' চন্দ্রা বলেছিল, 'আবার আসবেন।' কথাটা যে নিতান্ত ভদ্রতা নয়, একটা আন্তরিক আহ্বান ছিল, বুঝতে পেরেছিলুম। চন্দ্রা হীরকের দাম্পত্য জীবনটা কেমন, বুঝতে পারিনি।

তবে কেন যেন মনে হয়েছিল, চন্দ্রা বোধহয় সুখী নয়। নয় যে, সেটা কিছুকালের মধ্যেই বুঝতে পেরেছিলুম। ওর নিজের ভাষায়, 'আমি কক্ষচ্যুত হয়ে পড়েছি।' সেটা ও হীরকের সামনে বলেনি।

ক্রমেই বুঝতে পারছিলুম, আমাদের পরস্পরের মধ্যে একটা নৈকট্য গড়ে উঠছিল। এবং সেটা মনে মনে। কেউ কারোর কাছে তা প্রকাশ করিনি। আমাদের ভাষা ছিল চোখে, বোঝাবুঝিটা ছিল মনে। একটা বিষয় পরিষ্কার বুঝেছিলুম, ও ওর আবাল্যের জগৎ থেকে কেবল বিচ্ছিন্নই হয়ে পড়েনি। যে-জগতে এসেছিল, সেখানেও একেবারে বেমানান। ও ছিল খুবই একা। হীরক ওকে বুঝতে পারেনি, বোঝাবার চেষ্টাও করেনি। বিয়ের ছ' মাসের মধ্যেও ওদের পরস্পরের মধ্যে দৈহিক সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও, মনের দিক থেকে কোনো সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। ইতি মধ্যে হীরকের একটা ভালো চাকরি হয়েছিল। অর্থাভাব কোনো-কালেই ওদের ছিল না। শেঠ পরিবারের সঙ্গে বিয়েটা ঘটেছিল নিতান্তই আর্থিক মর্যাদাকে কেন্দ্র করে। শেঠ পরিবারে সাহিত্য শিল্প ইত্যাদির চর্চা থাকলেও, মেয়েরা নিজেদের পছন্দমতো বিয়ে করবে, সে আশাহাওয়া ছিল না। বিয়ের পর মেয়ে স্বামীর ঘরে গিয়ে যে-ভাবেই জীবন কাটাক, তাতেও আপত্তি ছিল না। যেমন চন্দ্রার দিদি স্বামীর সঙ্গে পার্টিতে যায়, মদ্যপান করে, পুরুষ বন্ধুদের সঙ্গে নাচে, এসব নিয়ে শ্বশুর বা বাপের বাড়িতে কোনো আপত্তি দেখা যায়নি চন্দ্রা ওর দিদির বিপরীত চরিত্রের মেয়ে। আর ওর ভগ্নীপতির তুলনায়, হীরক ছিল মধ্যপন্থী। মনে মনে রক্ষণশীল হলেও, স্ত্রীকে নিয়ে সিনেমা থিয়েটারে যাওয়াটা দোষের ছিল না। কিন্তু সিনেমা থিয়েটারের বিষয়ে ওর ছিল না কোনো রুচির বালাই, ফলে চন্দ্রাকে সঙ্গিনী হিসাবে পেতো না। আবার চন্দ্রা যে-সব নাটক, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বা চিত্রকলা প্রদর্শনীতে যেতো, সে-সবে হীরকের ছিল অতীব অনীহা। স্পষ্টই বলতো, ও-সবে ও কোনো আকর্ষণ বোধ করে না। চন্দ্রা এমন কোনো বিষয় খুঁজে পেতো না, যা নিয়ে হীরকের সঙ্গে আলোচনা করতে পারে।

হীরক চাকরি পাওয়ায়, ওদের বাড়িতে আমার যাতায়াত কমেছিল। হীরক কিছু অনুমান করতে পেরেছিল কি না, জানিনে। আমার সঙ্গে ওর মেলামেশা কমে এসেছিল। ও আমাকে আর আগের মতো বাড়িতে ডাকতো না। অথচ আমি আর চন্দ্রা, এমন একটা জায়গায় এসে পৌঁছেছিলাম, মনে হয়েছিল, আমরা পরস্পরকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারছি না। অথচ দুজনের কেউই এমন একটা পন্থা নিতে পারছিলাম না, সমাজের চোখে যেটা কলঙ্কজনক। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আবেগেরই জয় হয়েছিল। আর সেটা প্রতিদিনের বাঁচার প্রয়োজনেই। চন্দ্রাই প্রথম চিঠি লিখে জানিয়েছিল, 'অবশেষে মুখ খুলতেই হলো। এটা পরাজয় বা বিকার, বুঝতে পারছি না। মনে একটা পাপ বোধও কাজ করছে। কিন্তু ভিতরের রুদ্ধ দুয়ারটা এমন সপাটে খুলে গিয়েছে, পাপ বোধটাকে ঝড়ের বেগে উড়িয়ে দিয়েছে। হীরকের প্রতি আমার কোনো অভিযোগ নেই। হীরক যে পরিবারে যে-ভাবে মানুষ হয়েছে, ও আমার সঙ্গে সেইভাবেই আচরণ করছে। আমাকে বঞ্চিত করার বা দুঃখ দেবার কোনো ইচ্ছাকৃত ব্যাপার ওর মধ্যে নেই। আমারও একটা জীবন ছিল, আছে। হীরকের সংসারে এসে, আমি জীবন সঙ্গীর পরিবর্তে পেয়েছি এক কষ্টদায়ক একাকীত্ব। এর জন্য আমাকে কি দোষ দেওয়া যাবে? কিন্তু এসব যুক্তি তর্কের অবকাশ আর নেই। আমি জানি, আপনার পক্ষে এ বাড়িতে আসা ক্রমেই অসম্ভব হয়ে পড়ছে। হীরক পুরুষ মানুষ। ওর চরিত্রে যতো লঘু স্থূলতাই থাকুক, ওর পুরুষ প্রবৃত্তিই ওকে বুঝিয়ে দিয়েছে, আপনার আমার মধ্যে, একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। খুব সঙ্গত কারণেই ও ঈর্ষা বোধ করছে। ওকে দোষ দেবো না। কিন্তু নিজে যে তিলে তিলে মরে যাচ্ছি। এভাবে মরতে পারছি না। জানিনে, হোলি সিনার-এর তাৎপর্য এতে কিছু আছে কি না। আমি আপনার সাহচর্য সঙ্গ চাই। এখনও আমার স্বাধীনতা আছে, বাইরে যাবার। য়ুনিভারসিটিতে যাই। বাইরে ছাড়া আপনার সঙ্গে আর কোথায় দেখা করতে পারবো? কোথাও নয়। আমার পিত্রালয়ে অথবা

আপনাদের বাড়িতেও সম্ভব নয়। ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে আমার যাতা-য়াত আছে। কিন্তু সেখানেও বিস্তর পরিচিত মুখ। পরিচিত পরিবেশে দেখা সাক্ষাৎ সম্ভব নয়। তাছাড়া আছে সময়ের বিষয়। আপনার চাকরি, আমার ক্লাস। এসবের সমন্বয় রক্ষা করে, কোথায় কীভাবে আপনার দেখা পাবো, আপনিই স্থির করবেন। চিঠিটা খুব সহজে লিখতে পারছি না। হাত কাঁপছে, ঘামছি, নিঃশ্বাস দ্রুত। জীবনে এমন চিঠি লেখা এই প্রথম।'...

তারপর থেকেই শুরু হয়েছিল আমাদের দেখা সাক্ষাৎ। প্রায় একটা বছর কলকাতার নানা অজানা জায়গায় যে কীভাবে চন্দ্রার সঙ্গে ঘুরে বেড়িয়েছে, এখন ভাবলে অবাক হয়ে যাই। আমার কাজ, ওর য়ুনিভারসিটির ক্লাস, স্বভাবতই সে-সমন্বয় রক্ষা করা যায়নি। কলকাতাকে মাঝখানে রেখে, আমাদের গতিবিধি দক্ষিণে ডায়মণ্ডহারবার থেকে উত্তরে কল্যাণী পর্যন্ত প্রসারিত হয়ে গিয়েছিল। এমন মনে করার কোনো কারণ নেই, আমাদের সময় কাটতো কেবল সাহিত্য কবিতা আলোচনা করে। চন্দ্রার একটা কথাই সব বিষয়টিকে বুঝিয়ে দেবার মতো যথেষ্ট। তা হলো, 'শেষ পর্যন্ত সমাজ সামাজিকতা ন্যায় অন্যায় বোধকে পায়ে দলেই, আমি আমার নারী জীবনের সার্থকতাকে খুঁজে পেলুম। কিন্তু মহী, পরিণতিহীন এ কোন্ পথে আমাদের যাত্রা? এবার যে সে-সংকট ক্রমে আমার বুকের রক্ত শুষতে আরম্ভ করেছে। বিবাহ বিচ্ছেদ আমার দ্বারা সম্ভব নয়, সেই পরিণতি আমি মেনে নিতে পারবো না। তাতে যে-গোলমাল আর উৎপাতের সৃষ্টি হবে, তুমি সইতে পারলেও, আমি পারবো না। অথচ তোমার স্পর্শ নিয়ে হীরকের সান্নিধ্য কিছুতেই সহ্য করতে পারছি না। তুমি আমাকে শক্তি দাও।'...

আমি কী শক্তি দেবো চন্দ্রাকে? সে-ই তো আমার শক্তি। আমার পক্ষে যেটা সব থেকে সহজ ছিল, সেই বিবাহ বিচ্ছেদের প্রস্তাব ও নিজেই নাকচ করে দিয়েছিল। যাত্রার ইতি তো একমাত্র সেটাই

ছিল। সেই ইতি দিয়েই, নতুন জীবন শুরু করা। কী শক্তি ও আমার কাছে চেয়েছিল? ও চেয়েছিল, সেই শক্তি, ও যেন আমাকে ত্যাগ করতে পারে। আমার কাছ থেকে ফিরে যেতে পারে। কী মর্মান্তিক! সে তো বুকের পাঁজর নিজের হাতে খুলে দেবার মতো। ওকে ছেড়ে দেবার শক্তি আমার ছিল না।

সে-শক্তি চন্দ্রারই ছিল। ওর শেষ চিঠিতে লিখেছিল, 'তোমার কাছ থেকে ফিরে, আবার হীরকের সঙ্গে জীবনযাপন, কোনটাই আমার পক্ষে সম্ভব নয়। বুঝেছি, যা আমার নয়, তা আমি চিরকাল ভোগ করতে পারিনে। সংকট মোচনের উপায় স্থির করেছি। নিজের কাছ থেকেই আমাকে বিদায় নিতে হবে। তোমার কাছে একটাই প্রার্থনা আমাকে দিয়েই বুঝতে পেরেছো, জীবনের পূর্ণতার প্রয়োজনে বিয়ে একটা আবশ্যিক ব্যাপার। আমি যেন তোমার পথের বাধা না হই। ঠিক মেয়েটিকে খুঁজে নিও।' চন্দ্রা আত্মহত্যা করে সংকট মোচন করেছিল।

জানি না হীরক কিছু অনুমান করতে পেরেছিল কি না। বিষ খেয়ে আত্মহত্যার আগে, চন্দ্রা একটি চিরকুট লিখে রেখে গিয়েছিল, 'এ আত্ম-নাশ আমার পরাজয়। দায়ী কেউ নয়। আমিই আমার মৃত্যুর জন্য দায়ী।'

তারপরেই আমি হামবুর্গে চাকরি নিয়ে চলে গিয়েছিলাম। সে আজ ষোল বছর আগের কথা। হীরক আবার বিয়ে করেছে। চন্দ্রা আমার সে-পথ বন্ধ করে দিয়ে গিয়েছিল। বিয়ের কথা উঠলেই, চন্দ্রা আমার সামনে এসে দাঁড়াতো। অথচ আমি নিতান্ত বেলকাঠ ব্রহ্মচারী মানুষ নই। পরস্ত্রীর সঙ্গে প্রেম করেছি। কিন্তু ওকে পরস্ত্রী বলে ভাবতে পারিনি। একান্ত আমার বলেই ভেবেছি। হীরকের কিছু এলো গেল না। আর আমি চিরকাল ধরেই ভেবে আসছি. অসাধারণ তো নই। বিয়ের ইচ্ছা আমার আছে। কিন্তু চন্দ্রার পরিপূরক কোনো মেয়েকে তো আজ অবধি খুঁজে পেলাম না।

তবে এখন কেন বিয়ে করার সম্মতি দিয়েছি? বাবাকে আমি মিথ্যে কথা লিখিনি, মানব জন্মকে আমি সত্যি দুর্লভ জ্ঞান করতে শিখেছি। আর একান্তভাবে অনুভব করছি, শেষবারের জন্য চন্দ্রার পরিপূরক একটি মেয়েকে খুঁজে দেখবো। পূর্ণতার স্বাদ গ্রহণ করবো। দু মাস সময় হয়তো খুবই কম। কিন্তু ডাক্তার যে আমাকে নিদান দিয়েছেন মাত্র ছ' মাসের জন্য। ছ' মাসের মধ্যে মৃত্যু আমাকে অনিবার্য ভাবে গ্রাস করবে। বেদনাহীন দুরারোগ্য কর্কট রোগে আমি আক্রান্ত।... এবার হোস্টেসের ঘোষণা শুনতে পাচ্ছি, আর কয়েক মিনিটের মধ্যে আমরা কলকাতা আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের মাটি স্পর্শ করছি।...

১২ ডিসেম্বর: যা আশা করেছিলুম, তাই ঘটেছিল। দমদমে বাড়ির সকলের দেখা পেয়েছিলুম। প্রায় প্রতি বছরেই শীতকালে আমি কলকাতায় এসে থাকি। গত বছর আসিনি। গত বছরেই আমার কর্কট রোগটি ধরা পড়ে। চিকিৎসা চলতে থাকে। ডাক্তারের বক্তব্য ছিল, বুকের বাঁ দিকে, বগল ঘেঁষে যে একটি টোপা কুলের মতো আব দেখা দিয়েছিল, সেটির জন্য মাত্রই দেখানো উচিত ছিল। বেদনাহীন বলেই আমি ব্যাপারটাকে আমল দিইনি। ডাক্তার দেখেই সন্দেহ করেছিলেন। বায়োপ্‌সি করেছিলেন, এবং সন্দেহ সত্যে পরিণত হয়েছিল। অপারেশনও করা হয়েছিল। ওষুধ-বিষুধ যা খাবার, সবই নিয়মিত চালিয়েও, আবার সেটি বগলের কাছ থেকে বুকের দিকে এগিয়ে দেখা দিয়েছিল। ডাক্তারের আশঙ্কা, ঐ বেদনাহীন গ্রোথটি আবার অপারেশন করলেও, আবার হবে, এবং আমার হৃদযন্ত্রের গভীরে তা সে সময়ে অনুপ্রবেশ করেছিল। অপারেশন করলে, আমার হৃদযন্ত্র বাদ দিতে হবে। তাতেও নিশ্চয়তা ছিল না, গ্রোথটি আবার হবে না। বরং হবে, এটাই নিশ্চিত ছিল। অতএব মৃত্যু অনিবার্য। ডাক্তার বলেছিলেন, 'দুঃখিত মিঃ মুস্তফি, আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি, তোমার আয়ু শেষ হয়ে এসেছে। তোমরা ভারতীয়রা পূর্বজন্ম পরজন্ম বিশ্বাস কর।

পরজন্মের কথা চিন্তা করে, তুমি এ জীবনের বাকি দিনগুলোতে যা করবার করে নাও।'

এ জীবনে আমার আর কিছুই করার ছিল না, চন্দ্রার শেষ অনুরোধ রক্ষা করা ছাড়া। আর মানব জন্ম যে দুর্লভ, এমন করে কখনও অনুভব করিনি। আমি পূর্ব বা পরজন্মে বিশ্বাসী নই। জীবন একটাই। বাবা আমার চিঠি পাবার পরেই, বাড়ির সবাই আমার বিয়ের জন্য মেয়ে দেখতে শুরু করেছিল। বাবা মা তো বটেই। অন্তু অনীতা নীতুও, তবে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়নি।

মা বাবাকে দমদম বিমান বন্দরেই প্রণাম করেছিলুম। বাবার হাসি মুখে চোখ ছলছলিয়ে উঠেছিল। বুকে জড়িয়ে ধরে বলেছিলেন, 'দেরিতে হলেও তুই যে বিয়ে করতে রাজি হয়েছিস, এ বয়সে এর থেকে বেশি সুখ আর আমি কিছুতে পাবো না।' মা বুকে চেপে ধরে, আমার চোখ মুখের দিকে তাকিয়ে. একটু উদ্বেগের সঙ্গে বলেছিলেন, 'তোর চেহারাটা এবার একটু রোগা দেখছি। একটু যেন ফ্যাকাসেও। কেন রে? শরীরটা কি ভালো নেই?' আমি হেসে বলেছিলুম, 'ভালোই আছি।' আসবার আগে কয়েকদিন ব্যস্ত ছিলুম, পথেরও ক্লান্তি আছে। সেইজন্যেই বোধহয় এরকম দেখাচ্ছে।' অন্তু অনিতা নীতুর চোখে মুখে আনন্দ ধরছিল না। অনীতা আমাকে প্রণাম করতে এসে, নিচু স্বরে হেসে বলেছিল, 'যা সব মেয়ে দেখে রেখেছি, চোখ ঝলসে যাবে।' হেসে বলেছিলুম, 'সে কি অনীতা, চোখ ঝলসে গেলে দেখবো কেমন করে? আমি তো বাবাকে লিখেইছি. রূপের কথা তুলব না। কেবল মেয়েটির বয়স যেন তিরিশের কম না হয়।' অনীতা বলেছিল, 'দাদা, গোলমালটা ওখানেই। তিরিশ বছরের মেয়ে পাইনি একটিও। তবে আটাশ বছরের একটি মেয়ে পেয়েছি। নামটা একটু সেকেলে, জ্যোৎস্না। তবে সে জ্যোৎস্নার মতোইদেখতে, পূর্ণিমার চাঁদের মতোই রঙ। ইংরেজি সাহিত্যে এম. এ. পাশ করেছে: প্রথম শ্রেণীতে শুধু নয়, কলকাতা য়ুনিভার-সিটিতে ও সেকেণ্ডহয়েছিল। এখন বেথুন কলেজে ইংরেজির লেকচারার।'

বিমান বন্দরে আর কথা বাড়াই নি। কিন্তু অনীতা আমার মনে একটা দাগ এঁকে দিয়েছিল। চন্দ্রার পরিবর্তে, জ্যোৎস্না। যেন একই অর্থ প্রায় বহন করছে। ইংরেজি সাহিত্যে এম এ. পাশ। চন্দ্রা পাশ করার আগেই, নিজেকে শেষ করেছিল। কেবল বয়সটাই খটোমটো লেগেছিল। তা ছাড়া, আর একটা চিন্তা আমার মাথায় ঢুকেছিল। আটাশ ত্রিশ বছরের মেয়েরা কি প্রেমে পড়ে না? আর যাই হোক, এমন কোনো মেয়েকে যেন বিয়ে করতে না হয়, যে তার বাবা মা'র অনুরোধ রাখতে গিয়ে, প্রেমিককে বঞ্চিত করবে। প্রেম করেছে, অথচ পরে সেই প্রেম ভেঙে গিয়েছে, এমন মেয়েতে আমার আপত্তি ছিল না। এমন কি, কোনো মেয়ে যদি তার পুরুষ বন্ধুর সঙ্গে সহবাসও করে থাকে, তাতেও আমার আপত্তি নেই। বিধবা হলেও আপত্তি নেই। বাড়িতে সে-কথা বলেছিলুম। সকলেরই আপত্তি।

গত চার দিন ধরে তিনটি পরিবার আমাদের বাড়িতে এসেছে, মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে। আমরাও গিয়েছি একটি পরিবারে। বাবা মা সকলেই গোড়ায় একটা গলদ করে রেখেছেন। সেরা সব সুন্দরীদের দেখে রেখেছেন। অনীতা মিথ্যে কিছু বলেনি, সকলেরই রূপের ঝলক বড় বেশি। আমি আপত্তি করেছি। তাছাড়া চারটি মেয়েরই বয়স চব্বিশ পঁচিশের বেশি নয়। আর যাই হোক, আমার থেকে কুড়ি বছরের ছোট একটি রূপসী ফুলটুসি মেয়েকে আমি বিয়ে করতে পারবো না।

গতকাল রাত্রে জ্যোৎস্নার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। জ্যোৎস্নারই শর্ত ছিল, আমরা কেউ কারোর পরিবারে যাবো না। ও পার্কস্ট্রিটের একটি রেস্তোরাঁর নাম করেছিল, এবং সময় জানিয়ে টেলিফোন করেছিল, সেই সময়ে ও একলা সেখানে থাকবে। মহীতোষও একলা যাবে। চেনাচিনি? মহীতোষ যে-পোশাক পরেই আসুন, তাঁর হাতে যেন একটি লাল গোলাপ থাকে। ব্যাপারটি বেশ অভিনব আর রোমান্টিক। বাড়ির সকলের সঙ্গেই জ্যোৎস্নার পরিচয় ছিল। বাবা মা আপত্তি

করেননি। অনীতা ঠাট্টা করে বলেছিল, 'ঠিক আছে, আমরাও আজ রাত্রে রেস্তোরাঁয় খেতে যাবো।'

আমি পাজামা পাঞ্জাবীর ওপরে একটা কাশ্মীরি শাল চাপিয়ে গিয়েছিলুম। হাতে একটি লাল গোলাপ। রেস্তোরাঁয় ঢুকে দেখেছিলুম, এক কোণে একটি টেবিলে একটি মেয়ে একলা বসে আছে। টেবিলের ওপরে রাখা একটি লাল গোলাপে সে হাত বোলাচ্ছিল। রেস্তোরাঁ-কাম-বার নয়, তাহলে একলা একটি মেয়ের প্রবেশাধিকার থাকতো না। আমাদের দেশে এখনও এই নিয়ম চালু আছে, পানশালায় একলা মহিলাদের প্রবেশ নিষেধ।

রেস্তোরাঁটিতে ভিড় সেরকম ছিল না। খুব বড়ও না। একটু যেন নিরিবিলিই। পার্কস্ট্রিটের মতো জায়গায় এরকম রেস্তোরাঁ ফাঁকা থাকারই কথা। পরিচ্ছন্ন, স্বল্পালোক, পরিবেশটা ভালো লেগেছিল। আমি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে সেই কোণের টেবিলের দিকে তাকিয়েছিলুম। জ্যোৎস্নাও তাকিয়েছিল। হাতে ফুল তুলে নিয়েছিল। আমি ওর দিকে নিশ্চিত হয়েই পা বাড়িয়েছিলুম। কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই হেসেছিল, 'আমার নাম জ্যোৎস্নাময়ী ভট্টাচার্য।' আমিও হেসে বলেছিলুম, 'আমার নাম মহীতোষ মুস্তফি।' জ্যোৎস্না আর আমি পরস্পরকে নমস্কার বিনিময় করেছিলুম। বসেছিলুম মুখোমুখি। ওর সামনে ছিল কমলা লেবুর রসের গেলাস। ও উঠে দাঁড়াতেই বুঝে নিয়েছিলুম, অন্ততঃ সাড়ে পাঁচ ফুট লম্বা। অনীতা মিথ্যা বলেনি, চাঁদের মতোই ওর রঙ কোমল, অনুগ্র ফরসা। বুদ্ধিদীপ্ত উজ্জ্বল কালো চোখ টানা। ভুরু জোড়া কি প্লাক করা ছিল? বোধহয় না। এমনিতেই সরু। টিকলো নাক, ঠোঁট দুটি ঈষৎ পুষ্ট। কোনো প্রসাধনের প্রলেপ ছিল না। হাসিটি আড়ষ্ট, মিষ্টি। মাথার চুল বয়েজ কাট। মনে হয়েছিল পাড়হীন শাড়ি আর জামার রঙ যেন ওর গায়ের মতোই। বাঁ হাতের কব্‌জিতে ঘড়ি ছাড়া আর কিছুই ছিল না। ওকে দেখাচ্ছিল তাজা, স্বাস্থ্যবতী একহারা।

আমিও খানিকটা আড়ষ্ট বোধ করেছিলুম। কী দিয়ে কথা শুরু

করবো, ভেবে পাচ্ছিলুম না। জ্যোৎস্নার অবস্থাও অনেকটা আমার মতোই। ওর মুখে লজ্জার ছটা লেগে ছিল, এবং শেষ পর্যন্ত ও-ই প্রথম বলেছিল, 'এভাবে দেখা করার আইডিয়াটা আপনার অপছন্দ হয়নি তো?' বলেছিলুম, না! বরং বেশ ভালোই লেগেছে।' তারপরেই আবার চুপচাপ। এবং আবার জ্যোৎস্নাই জিজ্ঞেস করেছিল, 'আপনাকে কী দিতে বলবো? আমি একটা অরেঞ্জ স্কোয়াশ নিয়ে বসেছি। এখানে কোনোরকম এ্যালকোহল পাওয়া যায় না। আপনার কি তাতে অসুবিধে হবে?'

বলেছিলুম, 'না, এ্যালকোহলে আমার কোনো আসক্তি নেই। নিইনে, সেটাও ঠিক নয়, নিই, মাঝে মধ্যে, কম। আজ এখন তার কোনো দরকার নেই। আমিও বরং একটা ঠাণ্ডা কমলালেবুর রসই নেবো।' জ্যোৎস্না হাত তুলে, বেয়ারাকে ডেকে, কমলালেবুর রস দিতে বলেছিল, এবং সেই সঙ্গে আমাকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল, 'আপনি কিন্তু আজ এখানে খেয়ে যাবেন। অবিশ্যি যদি সেরকম কোনো আপত্তি না থাকে।'— আমি বলেছিলুম, 'কোনো আপত্তি নেই। তবে আপনি আমার অতিথি হলে আমি খুশি হবো।'

জ্যোৎস্না হেসে মাথা নেড়েছিল, 'তা কি করে হবে? আমিই তো আপনাকে ডেকেছি। আপনি আজ আমার অতিথি। আজকের পরেও যদি আমাদের দেখা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তখন আমি আপনার অতিথি হবো।'

কথাটা কিছু ভুল বলেনি। আপত্তি করতে পারিনি। কমলালেবুর রস এসেছিল। আমি জ্যোৎস্নার অনুমতি নিয়ে সিগারেট ধরিয়েছিলুম। ওকেও অফার করেছিলুম। ও দুঃখ ও ধন্যবাদ জানিয়েছিল। আমি আমার প্রথম প্রশ্ন তৈরি করে ফেলেছিলুম, এবং দ্বিধা ত্যাগ করে জিজ্ঞেস করেছিলুম, 'আপনি কিছু মনে না করলে একটা কথা প্রথমেই জেনে নিতে চাই।' ও বলেছিল, 'উচিত প্রশ্ন হলে নিশ্চয়ই জবাব দেবো।' বোঝা গিয়েছিল, জ্যোৎস্নাও দ্বিধা কাটিয়ে উঠেছিল। আমি জিজ্ঞেস করেছিলুম,

ণী—

'আমার প্রথমেই জানতে ইচ্ছে করছে,আপনার সঙ্গে যদি আমার সম্পর্ক ঘটে ওঠে, তার জন্য কেউ বঞ্চিত হবেন না তো?'

জ্যোৎস্নার চোখে ঠোঁটে উজ্জ্বল হাসি ফুটেছিল, 'তা হলে তো আমি আসতুমই না। আমার জীবনে এখনো সেরকম ঘটনা কিছু ঘটেনি আর পাল্টা জিজ্ঞাসাটা আমারও।' ও আমার চোখের দিকে তাকিয়েছিল। আমি এক মুহূর্ত চুপ করেছিলুম। তারপরে চন্দ্রার সংক্ষেপে কিন্তু বুঝিয়ে দেবার মতো সব কথা বলেছিলুম। একথাও বলেছিলুম, এ ঘটনার কথা আজ অবধি আমি কারোকে বলিনি। ওকেই প্রথম বললাম। জ্যোৎস্নার মুখে বেদনার ছায়া পড়েছিল। বলেছিল, 'শুনে কষ্ট পাচ্ছি, আর একটু ভয়ও। আমি কি আপনার সেই শূন্যতা পূর্ণ করতে পারবো?' বলেছিলুম, 'সেরকম প্রত্যাশা না করলে, ঘটনাটা আপনাকে বলতুম না। জীবনে আমার এই একটি ঘটনাই ছিল। আজ পর্যন্ত কারোকে বলতে পারিনি।' জ্যোৎস্না বলেছিল, 'বলে ভালোই করেছেন। আপনাকে বুঝতে আমার সুবিধে হবে। তবু একটা কথা জিজ্ঞেস না করে পারছিনে, ষোল বছর পরে, মত বদলালেন কেন?' বলেছিলুম, 'সে জবাব তো আপনাকে আগেই দিয়েছি। এত বছর পরে আমার মনে হয়েছে, আমি অপূর্ণ থেকে যাচ্ছি। আমি পূর্ণতা চাই।'

এ কথাটা বলার সময়ে, আমার হাত আপনিই চলে গিয়েছিল বুকের বাঁ দিকে। তিলে তিলে মৃত্যুর গ্রাসে এগিয়ে চলেছি। আর মুখে বলছি, পূর্ণতা চাই। জ্যোৎস্নাময়ী আমার চোখের দিকে তাকিয়েছিল। এবং চোখ নামিয়ে কয়েক মুহূর্ত কিছু ভেবেছিল। আমি আবার বলেছিলাম, 'অবিশ্যি আমার বিষয়ে আপনি ভাবুন। আমাদের পরিবার, আমার শিক্ষাদীক্ষা চাকরি, এসবই আপনি আগে দেখেছেন শুনেছেন। আমাকে এই প্রথম দেখছেন। আপনার বয়স মাত্র আটাশ। আমার চুয়াল্লিশ। ষোল বছরের তফাত। এসবই আপনি ভেবে দেখবেন।'

জ্যোৎস্না বলেছিল, 'সেটা তো আমারও কথা। আপনিও নিশ্চয় আমার কথা ভাববেন। আমরা কেউ কোন দাবি নিয়ে এখানে দেখা

করতে আসিনি। দুজনে একটু কথাবার্তা আলাপ আলোচনা করতে এসেছি। আমাকে অনীতা বলেছে, আপনি নিজে আপনার ভাবী স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতে চান। সেটা আমিও চেয়েছি। আপনিও আমার কথা ভাবুন। আমি আত্মনির্ভরশীলতা পছন্দ করি। কোনো বিষয়েই আমার গোড়ামি নেই, কিন্তু রুচি আছে। আমি আবেগ শূন্য নই, কিন্তু স্পষ্টবাদিতা ভালবাসি। গোঁড়ামি না থাকার অর্থ এই নয়, আমি সমস্ত বিষয়ে উদার। আমার উদারতারও একটা সীমা আছে। বড়লোক বলতে যা বোঝায়, আমরা তা নই, কিন্তু—।' ও থেমে গিয়েছিল। আমি ওর চোখের দিকে তাকিয়েছিলাম। ও একটু হেসে বলেছিল, 'আমাদের পরিবারেও শিক্ষাদীক্ষা সঙ্গীত শিল্প চর্চার আবহাওয়া আছে। কিন্তু ছেলে বা মেয়ের নিজের পছন্দমতো বিয়ে করার অধিকার সেখানে স্বীকৃত।'

জ্যোৎস্না কথাটা বলেছিল, চন্দ্রার কথা ভেবে। চন্দ্রাদের পরিবারে, জ্যোৎস্নাদের পরিবারের মতোই শিক্ষা সংস্কৃতির আবহাওয়া, কিন্তু চন্দ্রা-দের বাড়ির ছেলেমেয়েদের নিজেদের ইচ্ছা মতো বিয়ের অনুমতি ছিল না। স্বাভাবিক, অন্যথায় জ্যোৎস্না আমার সঙ্গে দেখা করতে আসতো না ; বা আসার অনুমতিও মিলতো না। অবিশ্যি জ্যোৎস্না নিজে চাকরি করে, আত্মনির্ভরশীল মেয়ে, ও ওর পছন্দ মতো বিয়ে করতেই পারে। আমি হেসে জিজ্ঞেস করেছিলুম, 'একটু আশ্চর্য লাগছে, আপনার যা চেহারা আর গুণ, তাতে এ পর্যন্ত এখনো আপনাকে কেউ শরবিদ্ধ করতে পারেনি।' জ্যোৎস্না শব্দ করে হেসে উঠেছিল, 'পারেনি, কিন্তু চেষ্টা তো অনেক হয়েছে। তবে শরগুলো ছিল বোধহয় খুবই ভোঁতা, আমাকে বিঁধতে পারেনি! আর—।' ও আবার থেমেছিল। আমি তাকিয়ে-ছিলাম ওর চোখের দিকে। ও বলেছিল, 'ভাববেন না যে, আমিও কারোকে বিদ্ধ করতে চাইনি। সে-ক্ষেত্রে বোধহয় আমারটাও ছিল সেই-রকম ভোঁতা। কিংবা বিদ্ধ করেই ফিরতে হয়েছে, কারণ লক্ষ্যবস্তুটি বিদ্ধ করার মতো ছিল না।'

আমরা দুজনেই হেসে উঠেছিলাম। জ্যোৎস্না মেনু কার্ড আমার দিকে এগিয়ে দিয়েছিল, 'কী খাবেন বলুন।'

বলেছিলুম, 'আপনি যা খাওয়াবেন, তাই খাবো। খাবার ব্যাপারে আমার তেমন কোন বাছাবাছি নেই।' জ্যোৎস্না চায়নিজ স্যুপ আর খাবার অর্ডার দিয়েছিল। আহার পর্ব শেষ হয়েছিল, আইস্‌ক্রীম দিয়ে। রাত্রি তখন সাড়ে ন'টা। দুজনের কারোরই গাড়ি ছিল না। ট্যাকসিতে উঠে, আমি ওকে পৌঁছে দিতে চেয়েছিলাম। ও রাজী হয়নি। বলেছিল, 'পরে যদি আপনি আমাকে ডাকেন, তখন পৌঁছে দেবেন।' সেটাতো একটা বড় কথা। এর পরে কে কাকে আগে ডাকবে? নিশ্চয়ই যে বেশি প্রয়োজন মনে করবে, বা সিদ্ধান্ত নিতে পারবে। জ্যোৎস্না আমাকে বাড়ির সামনে পৌঁছে দিয়ে বলেছিল, 'আপনার আমার বাড়ির টেলিফোন নাম্‌বার জানাজানি আছে। আমি সাধারণতঃ এগারোটা থেকে চারটে অবধি কলেজে থাকি। বিকেলে কোনো কোনোদিন হঠাৎ কোনো বন্ধুর বাড়ি চলে যাই, সিনেমা থিয়েটারে যাই। টেলিফোন বেলা এগারোটার মধ্যে হলেই সুবিধে হয়।'

আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

২৫ ডিসেম্বর, বড়দিন, রাত্রি দুটো : দুটো দিন ভাবলুম। তারপরে বাবা মা'কে জানালুম। অনীতা হাত তালি দিয়ে উঠলো। সবাইকেই খুশি দেখলাম। জ্যোৎস্নাকে সকলেরই ভালো লেগেছে। বাবা তো বলেই ফেললেন, 'মহী, তোর পছন্দের সঙ্গে আমার একশো ভাগ মিলে গেছে। তা হলে আজই—।' আমি বাধা দিয়ে বললাম, 'না, তোমরা এখন কিছু বলো না। আমি আগে জ্যোৎস্নার সঙ্গে কথা বলি। আমাকেও তো ওর মনের কথা জানতে হবে।' সকলেই আমার কথায় রাজী।

আমি জানি, আজ জ্যোৎস্নার নিশ্চয়ই ছুটি। তবু সকাল দশটাতেই টেলিফোন করলুম। জবাব পেলুম পুরুষের ভারী গম্ভীর স্বরে, 'হ্যালো?'

জিজ্ঞেস করলুম, জ্যোৎস্নাময়ী আছেন?' শুনলুম, 'আছেন, ধরুন, ডেকে দিচ্ছি।' প্রায় মিনিট খানেক পরে জ্যোৎস্নার গলা শুনলাম, 'হ্যাঁ, কে?' বললুম, আমি মহীতোষ। ব্যস্ত করলুম না তো?' ঈষৎ হাসির সঙ্গে জবাব, 'না। আজ তো ছুটি। কিছু পরীক্ষার খাতা দেখা ছিল। শেষ করে ফেলেছি।' জিজ্ঞেস করলুম, 'আজ কি আপনার সন্ধ্যা খালি আছে?' শুনলুম, 'আছে। কিন্তু আজ তো বড়দিন। সবখানেই বড্ড ভিড় আর হৈ চৈ। কোথায় দেখা করতে পারি?' বললুম, 'আজ হয় তো আমাদের বাড়িতেও কিছু কিঞ্চিৎ হৈ চৈ হতে পারে। তবে সেটা খুব অসহ্য হবে না। আমাদের বাড়ি আসবেন?' জ্যোৎস্নার দিক থেকে একটু দ্বিধার স্বর শোনা গেল, 'আপনাদের বাড়ি?' বললুম, আপনার সম্মতি থাকলে, আমি নিজে গিয়ে আপনাকে নিয়ে আসতে পারি।' শুনলুম, 'সেটাই ভালো। তবে প্রথমদিন আমাদের বাড়িতে আসবেন, একটু অস্বস্তি হতে পারে আপনার। সঙ্গে অনীতাকে নিয়ে আসুন। ওকে আমাদের বাড়ির সবাই খুব ভালো চেনে। বললুম, 'তা হলে বিকেল চারটা নাগাদ যাই?' শুনলুম, 'হ্যাঁ, তাই আসুন।' বললুম, 'আজ কিন্তু নিমন্ত্রণটা আমার।' শুনলুম হাসি, এবং কথা, 'ঠিক আছে।'

বাড়ির সবাইকে খবরটা জানিয়ে দিলুম। শুরু হয়ে গেল হৈ চৈ। নীতু, আমার ছোট বোন কিছুতেই ছাড়তে চাইলো না। আমার আর অনীতার সঙ্গ নিল। দুজনেই খুব সেজেছে, গন্ধ উড়িয়েছে। বাবার গাড়িটা পাওয়া গেল। জ্যোৎস্নাদের বাড়িতে গিয়ে দেখলুম, সকলেই আমাদের অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত। জ্যোৎস্নার মা নেই। ওর বাবার সঙ্গে পরিচয় হলো। সারা জীবন অধ্যাপনা করেছেন। মানুষটিকে দেখে কেমন ঋষিতুল্য মনে হলো। আমি প্রণাম করলুম। তিনি বিব্রত হেসে বললেন, 'থাক থাক, আসুন।'

'আসুন' শুনে অস্বস্তি বোধ করলুম। জ্যোৎস্নার তিন দাদা দুই বউদির সঙ্গে পরিচয় হলো। মনে হলো আমাকে তাঁদের ভালোই লেগেছে। যদিও আমরা জ্যোৎস্নাকে আনতে গিয়েছিলুম, তবু থাকতে

হলো ঘণ্টা খানেকের ওপর। কিছু খাবারও খেতে হলো। তিন ভাই-য়ের একমাত্র বোন জ্যোৎস্না। ওর তিন দাদারা প্রত্যেকেই প্রতিষ্ঠিত চাকুরিজীবী। এক বউদি, একটি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়ান, ভালো গান করেন। অন্য বউদি নাচে গানে পারদর্শিনী, ক্লাসিক নাচের ওপর রিসার্চ করে ডক্টরেট করেছেন।

জ্যোৎস্না আগেও আমাদের বাড়ি এসেছে। অনীতা ওর পুরনো বন্ধু। আমাদের বাড়িতে হৈ চৈ লেগে গেল। মা বাবা দুজনেই খুশি! অন্ত তো বটেই। আমাদের বাড়ির মাপের তুলনায় লোক কম। দোতলায় গিয়ে প্রথমে আমার ঘরেই বসলুম। অনীতা বললো, 'এবারে সাক্ষাৎটা যখন আমাদের বাড়িতে হচ্ছে, দুজনের নিভৃত আলাপের সময় এক দেড় ঘণ্টার বেশি দেওয়া যাবে না। আমরা কি হা করে বসে থাকবো?' জ্যোৎস্না হেসে বললো, 'এক দেড় ঘণ্টাই বা দিবি কেন? নিভৃত আলাপ না হয় না-ই হলো আজ? আয়, সবাই মিলে গল্প করি।' অনীতা বললো, 'তোদের এতটা বঞ্চিত করতে চাই নে। একটু কথাবার্তা বলে নে, তারপরে সবাই এসে জুটবো।'

আমি আর জ্যোৎস্না আমার ঘরে। ও আজ পরে এসেছে হাল্‌কা নীলের তসরের শাড়ি, পাড়ের রঙ গাঢ় নীল। বাসন্তী রঙের কাশ্মীরী লেডিজ শালে সূক্ষ্ম কাজ। নতুনত্বের মধ্যে দেখলুম, কপালে একটি সবুজ টিপ। আমার পাজামার ওপরে ছিল র সিল্‌কের মোটা পাঞ্জাবী। ঘরে ঢুকে শালটা বিছানায় রেখে দিলুম। আসবাব পত্রের মধ্যে খাট বিছানা, একটা ড্রেসিং টেবল। স্টিলের একটা আলমারি। বসবার জন্য মাত্র দুটো চেয়ার। এক পাশে আমার হামবুর্গ থেকে বয়ে আনা দুটো স্যুটকেস। বললুম, 'বসুন।' জ্যোৎস্না বসলো। আমি বিছানার ওপর এ্যাস্‌ট্রে রেখে, চেয়ার টেনে বসলুম। সিগারেট ধরালুম, জিজ্ঞেস করলুম, 'আপনি আজ এখানে না এলে, কী করতেন?' ও হেসে বললো, 'বাড়িতেই একটু গান বাজনার আসর বসতো, বাড়িতেই থাকতুম। আপনি কী করতেন, আমি না এলে?'

বললুম. 'সত্যি কথা যদি শুনতে চান তা হলে বলি, আপনার কথাই ভাবতুম।' আমার কথা শুনে, জ্যোৎস্নার মুখে লাল ছটা লেগে গেল। চোখের পাতা নামিয়ে নিল এবং চোখ না তুলেই বললো, 'আমি অবিশ্যি ক'দিন ধরেই আপনার কথাই ভাবছি।' আমার চোখে সাগ্রহ জিজ্ঞাসা ফুটে উঠলো। কী ভেবেছে ও এ কদিন? ও মুখ না তুলেই আবার বললো, 'এখনো ভাবছি, এখন আমার লম্বা ছুটি পড়ে গেছে। ছুটি পড়লেই আমার বেড়াতে যেতে ইচ্ছে করে। অবিশ্যি খাতা কিছু জমে আছে এখনো। দেখে ফেলবো সময় মতো।' আমার কথার সোজা উত্তর ও এড়িয়ে গেল। আমার শেষ কথা আমি বলে ফেলেছি। এখন জ্যোৎস্নার পালা। সময় তো ওকে দিতেই হবে। জিজ্ঞেস করলুম, 'কোথাও যাবেন, ঠিক করেছেন?' ও মাথা নেড়ে আমার দিকে তাকালো, 'না, ঠিক কিছুই করিনি। এমন নয় যে দূরেই কোথাও যেতে হবে। এমনও হয়, বন্ধুদের সঙ্গে ভোরবেলা বেরিয়ে গিয়ে সারাদিন কোনো একটা মনের মতো জায়গায় কাটিয়ে সন্ধেয় বাড়ি ফিরে এলুম। কাছে পিঠে বেড়াতে যাবার অনেক জায়গা আছে। তবে এ সময়টাই অন্য রকম।' জ্যোৎস্না হাসলো, 'শীতের দিনে ছুটি পেলেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়া, বাঙালীদের মধ্যে একটা সংক্রামক ব্যাপার। যেখানেই যাবো, সেখানেই ভিড়। অবিশ্যি সে-সব ভিড় শনি রবিতেই বেশি।'

আমি বললুন, 'আপনার তো এখন শনি রবি বলে কিছু নেই।' জ্যোৎস্না মাথা নেড়ে বললো, 'না, তা নেই।' একটু নড়তে গিয়ে ওর শাল বুকের কাছ থেকে সরে গেল। ও নিজেই শালটা গা থেকে খুলে চেয়ারের হাতলে রাখলো, এবং তাকালো আমার চোখের দিকে। আমার চোখে কি আবেগ সঞ্চারিত হচ্ছিল। আয়না তো নেই, দেখতে পাচ্ছিনে। কিন্তু আমার সামনে আয়না হয়ে বসে আছে জ্যোৎস্না। ওর মুখে লজ্জার ছটা, চোখের পাতা নামাতে দেখেই বুঝলুম, আমার চোখ খুব সহজে ওর দিকে দেখছে না। আমি বললুম 'আমার যা বলার, তা বোধহয় বলা হয়ে গেছে। এখানে আসার

পরে, আমাকে যে কয়েকটি মেয়ের সঙ্গে পরিচয় করানো হয়েছিল, আমি বাবা মা সবাইকেই জানিয়ে দিয়েছি, আর কারোর সঙ্গে আমার পরিচয়ের দরকার নেই।'

জ্যোৎস্না তাকালো আমার দিকে, এবং অবাক করে দিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'আপনি সাঁতার জানেন?'

সাঁতারের প্রসঙ্গ কেন এলো, বুঝতে পারলুম না। বললুম, 'জানি।' ও জিজ্ঞেস করলো, নৌকোয় বেড়াতে ভালবাসেন? উৎসাহ পেয়ে বললুম 'ভালবাসি। অনেক কাল বেড়াইনি।' ও বললো, 'তা হলে চলুন, আগামীকাল সকালে আউটরাম ঘাট থেকে সারা দিনের জন্য নৌকো ভাড়া করে বেড়িয়ে আসি। ওতে ভিড় এড়ানো যায়। বেলা দশটায় বেরিয়ে আমরা বিকেলে ফিরতে পারি। দুপুরের জন্য কিছু শুকনো খাবার, আর জলের পাত্র নিয়ে গেলেই হবে।' এ তো পরিষ্কার আমন্ত্রণ, এবং একেবারে ভূমির ভিড় ছেড়ে দুজনের একান্তে ভেসে যাওয়া। আমি হেসে বললুম, 'অতি উত্তম প্রস্তাব। আমার মাথায় কিছুতেই আসতো না। তা ছাড়া শীতের দিনে গঙ্গায় কোনো ভয়ও নেই। আপনি নিশ্চয়ই সাঁতার জানেন?' বললো, 'তা জানি।' তা হলে এ প্রস্তাবই বহাল রইলো। আমরা নিশ্চয়ই দুজনে বাড়িতে বলে যাবো?' জ্যোৎস্নার কালো আয়ত চোখে বিস্মিত হাসি ফুটলো, 'তা তো নিশ্চয়ই, আমরা তো লুকিয়ে অভিসার করতে যাচ্ছি নে?' বলে ও ওর মিষ্টি হাসি হাসলো, 'অবিশ্যি লুকিয়ে অভিসারে যাওয়াটা অনেক বেশি রোমান্টিক। আপনার সে-অভিজ্ঞতাও আছে।' জ্যোৎস্নার চোখ আমার চোখের ওপরে। ও চন্দ্রার কথা বলছে। বললুম, 'তা আছে। তবে পরস্ত্রী বলেই সেই অভিসারে একটা কেমন অপরাধবোধ ছিল।' জ্যোৎস্না হেসেই বললো, 'বৈষ্ণব সাহিত্যে তো পরকীয় অভিসারেরই জয়গান। মন যেখানে অটল, সেখানে অপরাধবোধ একটা অকারণ বাড়তি জিনিষ। আমি কিন্তু কথাটা বিশেষ কিছু ভেবে বলিনি। পরস্ত্রীই হোক, আর পরের কন্যাই হোক, দুজনের

মধ্যে যখন মেলামেশার আকাঙ্ক্ষা তুর্নিবার হয়ে ওঠে, তখন আর কোনো কিছুরই বাধা সেখানে থাকে না। বাধা সমাজ, পরিবার, কিন্তু অপরাধবোধ কিসের? অপরাধবোধ থাকতে পারে, যদি তু'জনের মধ্যে ইচ্ছা অনিচ্ছার জোর খাটাবার ব্যাপার থাকে।'

আমি জ্যোৎস্নার কথাগুলো পুরোপুরি মেনে নিতে পারলুম না। বললুম, 'বিষয়টা কি কেবলই তুজনের? সমাজ সংসার একেবারে বাদ? ব্যক্তিকে কি আমি সমাজের ঊর্ধ্বে রাখবো? সমাজের কাছে তার কোনো দায় নেই?'—জ্যোৎস্না পরিষ্কার বললো, 'না, ও দায়কে আমি স্বীকার করতে চাইনে। ব্যক্তির সংকটের মূলে সমাজ, কিন্তু যে-সমাজ আজ আমাদের চারিদিকে দেখছি, ব্যক্তির বিকাশ বা সংকট মোচনের পক্ষে তার দান কী আছে? আপনি ষোল বছর হামবুর্গবাসী। এ বিষয়ে আপনার অভিজ্ঞতা আমার থেকে বেশি আছে বলে মনে করি।' বললুম, 'য়ুরোপের সমাজের চেহারা একেবারে আলাদা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পুরনো মূল্যবোধ সব চেটে পুটে খেয়ে ফেলেছে। সমাজ পরিবারের কনসেপশানই বদলে গেছে। বিচ্ছিন্নতা, সর্বনাশা অস্থির-তায় মানুষ ভুগছে।'

জ্যোৎস্না বললো, 'আর আমাদের মূল্যবোধ বুঝি আগের মতোই থেকে গেছে? আমরা যুদ্ধ করিনি ঠিকই, কিন্তু হাজার হাজার পরিবার সকল লজ্জা ত্যাগ করে, এক মুঠো ভাতের জন্য রাস্তায় পড়ে মরেছে। মৃত দেহ তোলবার লোক ছিল না। অস্তিত্বের সংকটে মানুষ কোথায় নামতে পারে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আমাদের তাও দেখিয়ে দিয়েছে। তারপরে এই দেশ ভাগ। কোটি কোটি মানুষকে রাতারাতি ভিটে ছাড়া হতে হয়েছে, স্বদেশ হয়ে গেছে বিদেশ। অথচ যেটাকে বলা হলো তাদের স্বদেশ, সেখানে স্বদেশের স্বাদ তারা পায়নি। এপারের মানুষ তাদের অবাঞ্ছিত অনাহুত মনে করেছে। বিচ্ছিন্নতা অস্থিরতা থেকে কি আমাদের দেশ মুক্ত? সমাজ পরিবারের কনসেপশান এখানে কি বদলায় নি? আমি কী ভাবে বাঁচছি, আর আমার

প্রতিবেশী কী ভাবে বাঁচছে, আমি কি একবারও তা ভাবি? ভাবিনে। দুস্তর আমাদের ব্যবধান। সমাজ কোথায়। আমি তার কাছে কিছু প্রত্যাশা করিনে, সেও আমার কাছে কিছু প্রত্যাশা করে না। মানুষ যদি তার দায়বোধ পালন করতো, আপনার বন্ধু হীরকের তো উচিতই হয় নি চন্দ্রাকে বিয়ে করার। চন্দ্রারও কি উচিত ছিল, পারিবারিক সম্মানের কাছে নিজেকে বলি দেওয়া? কেন সে প্রতিবাদ করেনি? আত্মনাশ করে সে সমাজকে কী দিয়ে গেছে? পরিবারের কী সম্মান বেড়েছে? হীরকবাবু আবার বিয়ে করে দিব্যি জীবন কাটাচ্ছেন। কে কী দায় পালন করলেন? সমাজের কী উপকার হলো? বিপন্ন ব্যক্তির সংকটের সঙ্গে সমাজের যোগাযোগ কোথায়?'

জ্যোৎস্না কথাগুলো বলতে বলতে যেন লাল হয়ে উঠলো। ও যে এই মুহূর্তে ভেবে কথাগুলো তৈরি করেছে, তা নয়। কথা শুনলেই বোঝা যায়, এসব নিয়ে ও ভেবেছে। আমারও তো ভোলা উচিত নয়, বিশ্ব-চিন্তার থেকে ও বিচ্ছিন্ন নয়। ওর বিশ্বাস মতো, অন্যায় কিছু বলেনি। যে-সমাজ পরিবার চন্দ্রাকে কিছু দেয়নি, সেখানে তো ওর প্রতিবাদই করা উচিত ছিল। তবু ব্যক্তি কি তার দায়বদ্ধতা থেকে নিরঙ্কুশ মুক্তি পেতে পারে? প্রশ্নটা তোলবার আগেই, দরজার কাছে টিং টিং করে ঘণ্টা বেজে উঠলো। অনীতা মায়ের পূজার ঘরের ঘণ্টাটা এনে বাজিয়ে দিয়ে বললো, 'এক ঘণ্টা হয়ে গেল। এটা ফার্স্ট বেল। আর দুবার।'

জ্যোৎস্না হেসে উঠে বললো, 'একটা ওয়ার্নিং যথেষ্ট। আমাদের নিভৃত আলাপের আর কোনো প্রয়োজন নেই।' ও আমার দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকালো। আমি অনীতাকে বললাম, 'তোমরা চলে এসো।' আমাদের নিভৃত আলাপের ব্যবস্থা তো পাকা হয়ে গিয়েছে। অনীতা অন্তু নীতু হৈ হৈ করে এসে ঢুকলো। অন্তু বললো, 'জ্যোৎস্না আজ আমরা একটু বড়দিন করবো। আমার দাদা একেবারে বেরসিক সবাই বাইরে থেকে কতো হুইস্কি টুইস্কি নিয়ে আসে. দাদা ভালো

এক কার্টন সিগারেট পর্যন্ত আনেনি। ক্যামেরা প্রোজেকটার টেপ-রেকর্ডার, গাদা গুচ্ছের অডিকলন সেন্ট—সে অনেক কিছু। আমি এক গরীব কোম্পানির সামান্য চিফ একজিকিউটিভ। আমার যোগাড়ে দু চারটে স্কচ আর ব্রাণ্ডি, কোনিয়াক রেড ওয়াইন আছে। তোমার কোনো আপত্তি নেই তো?' জ্যোৎস্না হেসে বললো, 'আমার কেন আপত্তি থাকবে। তবে তুমি যদি আমাকে হুইস্কি খেতে বল, আমি পারবো না। জানি অনীতা আজকাল ওসবে খুব ধাতস্থ হয়েছে। আমি একটু রেড ওয়াইন নিয়ে তোমাদের সঙ্গে গল্প করবো।' অন্তু হেঁকে বললো, 'চমৎকার! নীতু, বাহাদুরকে বল্ ওপরে আমার ঘরে সব ব্যবস্থা করতে।'

অনীতার বন্ধু সমবয়সী জ্যোৎস্না। অতএব অন্তরও বন্ধু। নীতু এখন য়ুনিভারসিটিতে মডার্ন হিস্টরি নিয়ে পড়ছে। আমাদের আসরেও বেমানান নয়। আমিও একটু হুইস্কি খেলুম। দেখলুম, জ্যোৎস্না অনেক মজার গল্পও বলতে পারে। আমি আমার বুকের বাঁ দিকে একবার হাত স্পর্শ করলুম।

৭ জানুয়ারি: পরের দিন নৌকা ভ্রমণ দিয়ে আমাদের নিভৃত আলাপের শুরু। আমার আর জ্যোৎস্নার দূরত্বের ব্যবধান প্রতিদিনই কমে আসতে লাগলো। জ্যোৎস্নার ভাবনা দ্বিধা ঘুচে গিয়েছে। ও সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ঠিক শর্ত বলতে যা বোঝায়, তা নয়। তবে ওর একটি বড় ইচ্ছা, আমার সঙ্গে যেখানেই যাক, একেবারে ডোমেস্টিক ওয়াইফ হয়ে থাকতে পারবে না। বাইরে কোথাও কাজ করবে। আমার কি আপত্তি থাকতে পারে? জার্মানিতে ভাষা একটা বাধা। ও জানে না। শিখে নেবে।

অনীতা জ্যোৎস্নার কাছ থেকে ওর মনের খবর নিয়ে নিয়েছে। বাড়িতেও আনন্দের সাড়া পড়ে গিয়েছে। বিয়ের আয়োজন আর কেনাকাটা শুরু হয়েছে। জ্যোৎস্নার বাবা এসেছেন আমাদের বাড়িতে।

আমার বাবা মা গিয়েছেন ওদের বাড়িতে। সময় তো বিশেষ হাতে নেই। দুই পরিবারে চলেছে আয়োজন। আমরা দুজনে ক্রমে নিবিড় সান্নিধ্যে।

আমি যেন প্রতিদিন জ্যোৎস্নাকে নতুন করে আবিষ্কার করছি। জ্যোৎস্নাও। আমি ওকে তুমি সম্বোধন করছি। ও এখনও পারছে না। বলেছে, ওটা তো অনিবার্য, দু দিন আগে আর পরে। ঠিক সময় মতোই সব হবে। কিন্তু আমার ভিতরে যে একটা তোলপাড় শুরু হয়ে গিয়েছে, সেটা কেউ বুঝতে পারছে না। আমি যতো জ্যোৎস্নাকে দেখছি, ততোই মনের মধ্যে একটা অস্থিরতা বাড়ছে।

আটাশ বছরের একটি স্বাস্থ্যবতী তাজা যুবতী। ওর চোখের আবেগ, অন্য কথা। ও নিজেকে এমন ভাবে সমর্পণ করতে চলেছে, যেখানে ও একান্তভাবেই রমণী। ওর শিক্ষা কালচার, সমস্ত কিছুর ঊর্ধ্বে, নারী তার আটাশ বছর বয়সে, প্রথম একজন পুরুষের কাছে নিজেকে নিবেদনে উদ্যত। আর, যে-আমি জীবনের পূর্ণতার কথা ভেবে কলকাতায় ছুটে এসেছি, তার আয়ুষ্কাল আর মাত্র চার মাস। সেটাও অনিশ্চিত। ডাক্তারের নিদান মতে, ছ মাসের যে কোনো সময়ে। তার মধ্যে এক মাস হামবুর্গে কেটেছে। কলকাতায় এসে তিন সপ্তাহ কেটে গেল। আমি কোনোকালেই আস্তিক ছিলুম না। চন্দ্রার আত্মহত্যার পর পুরোপুরি নাস্তিক। এখন জ্যোৎস্নার মুখোমুখি হয়ে, আমার আর্তের মতো চিৎকার করে বলতে ইচ্ছা হচ্ছে, শুভ অশুভ যে কোনো শক্তির কাছে আমি আত্মসমর্পণে রাজী, আমাকে আর কয়েক বছরের আয়ু দাও। এ পৃথিবীতে তো কতো আশ্চর্য ঘটনা ঘটে। মহাভারতে পড়েছি, দৈব আর পুরষ্কারের মিলনই জীবনকে সার্থক করে তুলতে পারে। কি সেই দৈব ? সেই দৈব আমার হোক। আমি আমার পুরুষকার দিয়ে, তা সার্থক করে তুলবো। প্রাণ দাও আমাকে। আয়ু দাও আমাকে। জ্যোৎস্নার সঙ্গে আমার নিরবচ্ছিন্ন মিলনের জীবন দাও। একদা চন্দ্রার কাছে আমি যা পেয়েছি, জ্যোৎস্না তার থেকেও গভীরতর

এক জীবনের সম্ভাবনা নিয়ে আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। ওকে বঞ্চিত করো না। আমাকে মেরো না।

ডায়রিতে যখন এসব কথা লিখছি, দেখছি, আমার দু চোখ জলে ভেসে যাচ্ছে। চন্দ্রার আত্মহত্যার পরেও, আমার চোখ থেকে জল পড়েনি। জ্ঞানতঃ মনে করতে পারিনে, আমার চোখ জলে ভাসছে। চন্দ্রা সিনিক ছিল না। সেইজন্য ও আমাকে পূর্ণতার কথা লিখতে পেরেছিল! কিন্তু আমি সিনিক হয়ে গিয়েছিলাম। এখন আর আমার মধ্যে সেই সিনিসিজম্ নেই।

১৮ জানুয়ারি: মাঘ মাস পড়েছে। দুই পরিবারে কথা বলে, একুশে মাঘ বিয়ের দিন স্থির করেছে। তার আগেই আমাদের বিয়ে রেজিস্ট্রি করা হবে, তার জন্য ম্যারেজ রেজিস্ট্রেশন অফিসে বিজ্ঞপ্তিও দেওয়া হয়ে গিয়েছে। স্থির হয়েছে, আমাদের আশীর্বাদ হবে বিয়ের পিঁড়িতেই। আজ ৩রা মাঘ। আর মাত্র আঠারো দিন বাকি।

গতকাল জ্যোৎস্নার এক নতুন রূপ দেখলুম আমি। ডায়মণ্ডহারবারে গিয়েছিলুম আমরা। জ্যোৎস্না আগেই সেখানে ট্যুরিস্ট লজে একটি ঘর বুক করে রেখেছিল। ছিলুম সকাল থেকে সারাদিন। ডায়মণ্ডহারবারে পৌঁছে, জ্যোৎস্না বললো, 'আজ আমি সারাদিন ঘরের মধ্যে থাকবো, বাইরে যাবো না। ইচ্ছে হলে, ব্যালকনিতে রোদে বসে মোহনা দেখবো। আমার যা ইচ্ছে করবে, তাই করবো।' কথাটা কেন বলেছিল, প্রথমে বুঝতে পারিনি। নিচের তলায় লজের এন্ট্রি বুকে, ও আমাদের পরিচয় লেখালো স্বামী স্ত্রী বলে। ওপরে ঘরে গিয়ে বললো, এবং আমাকে রীতিমতো চমকে দিয়ে, 'মহী, আজ আমি ক্রাশড আইস্ দিয়ে একটু জিন্ খাবো। তুমি কি খাবে?' গতকাল ও আমাকে প্রথম তুমি এবং নাম ধরে ডাকলো। দেখলুম, ও ওর সমস্ত দ্বিধা দ্বন্দ্ব বিসর্জন দিয়ে, আবেগে যেন থর্থর্ করে কাঁপছে। কয়েক মুহূর্ত অবাক চোখে ওর মুখের দিকে তাকিয়েছিলুম। আমার বুকের ভিতরে কাঁপছিল। নারীর এ অন্যরূপ। একটু অন্যভাবে হলেও, নিজেকে নিঃশেষে সঁপে দেবার এই

রূপ আমার অচেনা নয়। কিন্তু জ্যোৎস্না কার কাছে নিজেকে সঁপে দিতে চাইছে? আমি যেন আমার পচে যাওয়া হৃৎপিণ্ডের দুর্গন্ধ পেলুম। মনে হয়েছিল, সেই মুহূর্তেই ওকে সব বলে ফেলবো। আর তা মনস্থ করেই, ওকে আমি দু হাতে কাছে টেনে নিয়েছিলুম। ও ভুল বুঝেছিল। আমি কাছে টানতেই, ও আমার বুকে মুখ রেখে, দু হাতে গলা জড়িয়ে ধরেছিল। দেখেছিলুম ওর তুলে ধরা মুখে ও চোখে অন্য এক প্রত্যাশা। খোলা ঠোঁটের ফাঁকে ওর ঝকঝকে শাদা দাঁত দেখা যাচ্ছিল। আমি কথাটা বলতে পারলুম না। ওর প্রত্যাশা মেটাবার জন্য মুখ নামিয়েছিলুম,অশ্লেষ চুম্বনে পরস্পরের অমৃত পানে ডুবে গিয়েছিলুম। মনে মনে বলেছিলুম, 'মহীতোষ ঘণ্টা বাজছে। ঘণ্টা বাজছে! আর সে-ঘণ্টা বাজিয়ে দিল জ্যোৎস্নাই। সময় আর নেই। শেষ সর্বনাশ ঘটবার আগেই, সময় এসেছে, তা রোধ করার। নিজের পাপ আর বাড়িও না।

তবু গতকাল জ্যোৎস্নাকে বলতে পারিনি। গতকাল ওর মধ্যে একটা বেপরোয়া ভাব ছিল। এবং আমি ওর প্রত্যাশা মেটাতে পারিনি। ও একটা মুহূর্ত আমার কাছ থেকে সরে থাকেনি। সর্বদা আমার ঘন সান্নিধ্যে কাটিয়েছে। আমার আড়ষ্ঠতা দ্বিধা ওকে অবাক করেছে। এমন কি, এ কথাও বলেছে, যতোদূর জানি, তুমি সিদ্ধান্ত নিয়েছো আমার আগে। আমার সম্পর্কে কি তোমার মনে নতুন কোনো প্রশ্ন জেগেছে?....ওর পক্ষে এ প্রশ্ন স্বাভাবিক, আমি ওকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে বলেছি, 'তোমার সম্পর্কে আমার মনে কোনো নতুন প্রশ্ন জাগেনি। যদি কিছু জেগে থাকে, তা আমার সম্পর্কে।' ও জিজ্ঞাসু ব্যাকুল চোখে আমার দিকে তাকিয়ে থেকেছে। আমি বলেছি 'আজ সে কথা বলবো না। তবে বলবো—খুব শীগ্‌গিরই বলবো।'....আমি স্থির করেছি, আজ বিকালে জ্যোৎস্নাদের বাড়ি গিয়ে, ওকে সব কথা বলবো।

১৯ জানুয়ারি : জ্যোৎস্না আমার সমস্ত বিশ্বাসকে টলিয়ে দিয়েছে।

গতকাল ওদের বাড়ি গিয়ে, আমি আমার সব কথা বলেছি। বিশ্বাস-ঘাতকতার অপমান নিয়ে ফিরে আসবো, এই বিশ্বাস নিয়েই আমি প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিলুম। সব কথা শোনার পরে, ও আমাকে জড়িয়ে ধরে উদ্বেগের সঙ্গে জিজ্ঞেস করেছে, 'এ কথা আর কে জানে?' বলেছি, তোমাকেই প্রথম বললুম।' ও আমার হাত ধরে, নিজের বুকে চেপে ধরে বলেছে, 'তবে আর কারোকে বলো না, এ বিয়ে হবে। আমি জানি, লোকে তোমাকে কী বলবে। কিন্তু আমি তা কখনো বলবো না। তুমি কোনো অন্যায় আমার ওপর করোনি। তুমি যা চেয়েছিলে তা ঘটবে। তোমার ভাগ্যের সঙ্গে আমি এভাবেই জড়াবো।' আমি বাধা দিয়েছি, 'কিন্তু জ্যোৎস্না, আমি যা চাইনি, তাই করতে যাচ্ছিলুম। তুমি যা করতে যাচ্ছো, এ তো অন্তর্জলী যাত্রার মতো। জেনে শুনে এক আসন্ন-মৃত্যু মানুষকে কেন তুমি বিয়ে করবে?' ও বলেছে, 'আমার মতো যুক্তিবাদী মেয়ের কোনো জবাব নেই এ বিষয়ে। তোমাকে বিয়ে করা, আমার কাছে সব যুক্তি তর্কের ঊর্ধ্বে। আমার আটাশ বছরের দেহে মনে যা ঘটেনি, তুমি তাই ঘটিয়েছো। এটা একটা চূড়ান্ত ব্যাপার। তুমি যে কদিনই বাঁচো, আমি তোমার স্ত্রী। সংসারে মানুষ বাঁচে একান্ত-ভাবে নিজের জন্য। আমিও আমার নিজের জন্যই বাঁচছি, সেজন্যই তোমাকে ছাড়ছিনে। তবে একটা কাজ করতে হবে। কাল সকালেই আমি তোমাদের বাড়ি যাবো। তার আগে বাবা দাদার সঙ্গে কথা বলবো। বিয়ের তারিখটা আরো যতো সম্ভব এগিয়ে নিয়ে আসতে হবে। আমি জানি, এ মাসে অনেকগুলো বিয়ের দিন আছে।

আমি জ্যোৎস্নাকে কিছুই বোঝাতে পারিনি। আজ সকালে ও আমাদের বাড়ি এসেছিল। সঙ্গে ওর বাবা। বিয়ের তারিখও এগিয়ে আনা হয়েছে। আমাদের বাড়ির লোকের মনে বিস্ময়। একটা বিশ্বাসও বোধহয় হয়েছে, গতকাল রাত্রে আমিই জ্যোৎস্নাদের বলে, বিয়ের দিন এগিয়ে এনেছি। এ নিয়েও অনেক হাসি ঠাট্টা হয়েছে। জ্যোৎস্না সারাদিন আমাদের বাড়ি ছিল। সন্ধ্যায় ফিরে গিয়েছে। যাবার আগে

বলে গিয়েছে, 'উপায় থাকলে তোমাকে ছেড়ে যেতুম না। রাত্রিটা কোনোরকম আজেবাজে চিন্তা না করে ঘুমোও। আমি কাল সকালেই আসবো। আমার মুখ চেয়ে অসুখের কথা চিন্তা করো না।'

এখন রাত্রি প্রায় দুটো। আমার সামনে তীব্র বিষ। জিভে স্পর্শ মাত্রই জীবন শেষ। হাতের কাছে ডায়রি কলম। এই পর্যন্ত লিখে চুপ করে আছি। বিষ আর জ্যোৎস্নার মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে আমি। আমি নিজেকে জানি! এই বিষের ছোবল কী, তার পরিণতি জানি। জানিনে কেবল জ্যোৎস্নাকে। জ্যোৎস্নাকে জানার অপেক্ষায় সময় কাটাচ্ছি।

তিন

'ডোণ্ট টিচ মী ট্রেড ইউনিয়ন।' চাপা গর্জনের মতো, নিচু শক্ত স্বরে কথাগুলো উচ্চারণ করলো দেবনাথ। কারোর উদ্দেশে না। কারণ ঘরে কেউ নেই। ডাইস মেসিন টেবিলের ওপর থেকে সে ড্রিল মেসিনটা শক্ত হাতে তুলে নিল। চোয়াল শক্ত করে ড্রিল মেসিনে চাপ দিল। উত্তরের খোলা জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকালো। তামাটে চওড়া মুখটা যেন আরও চওড়া হলো। উঁচু, কিন্তু মোটা নাকটা মোটা হলো আরও। বড় বড় শুঁয়ো পোকার মতো ভুরু জোড়া কুঁচকে উঠলো। কালো বড় চোখের দৃষ্টিতে ক্রুরতা, অথচ মোটা ঠোঁট জোড়ায় যেন ব্যঙ্গের হাসি। তামাটে মুখ যথেষ্ট চওড়া হলেও, শরীরটা চওড়া না। মেদ নেই, রোগাও বলা যায় না। লম্বা, শক্ত শরীর, দু হাতের শিরাগুলো একটু বেশি স্পষ্ট। মুখে দুদিনের আকাটা গোঁফ দাড়ি, লাল মাটিতে অভ্রের কুচির মতো দেখাচ্ছে। চওড়া কপালে, নাকের পাশে গাঢ় রেখা। মাথার পাতলা চুলে পাক ধরেছে। কপালের ওপর এসে পড়েছে এক গুচ্ছ চুল। নীল জিন্স্-এর কাউ বয় ট্রাউজার। কোমরে চওড়া বেল্ট। গায়ের হাত কাটা গেঞ্জি, ট্রাউজারের কোমরে গোঁজা। গলায় একটা রূপোর চেনের সঙ্গে, চৌকো চ্যাপটা লকেট। আসলে মাদুলি। দেখে মনে হয় অন্যরকম। বাঁ হাতের কবজিতে স্টিল ব্যাণ্ডের বড় ঘড়ি। পায়ে হাওয়াই চপ্পল।

দেবনাথ—দেবনাথ দত্ত। দত্ত ম্যানুফ্যাকচারার্স প্রাঃ লিঃ-এর মালিক। ঘরের উত্তর দিকে দেওয়ালের খোলা জানালা দিয়ে সে ওদের দেখলো। চারজন বসেছিল একটা গাছের ছায়ায়। চারজনেই বিড়ি টানছিল। নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলছিল, আর হাসছিল। ফাল্গুনের বেলা প্রায় এগারোটা। বাতাসে যেন একটা ঝোড়ো বেগ। গাছের ডাল-

পালায় ঝর ঝর শব্দ, মাতালের মতো টলছে। মাঝে মাঝে পাতা ঝরছে। কোকিলের পক্ষে যথেষ্ট কারণ থাকলেও, আপাতত যেন অর্থহীন ভাবে ডেকে চলেছে। বুনো কুল ঝোপে প্রমত্ত চড়ুইয়ের ঝাঁক। তাদের কিচিরমিচিরের সঙ্গে, দোয়েলের শিস্। উত্তরের দিকে, জমির অনেকটা অংশে ছড়িয়ে আছে পেপার মিলের নীল্চে রাবিশ। ঘেঁস আর ছাই। ধুলো উড়ছে। রাবিশ ঘেঁস ছাই ভরা জমির পরেই জল। কোথাও বেশি, কোথাও নয়ানজুলির মতো ফালি রেখা, ভাঙা আয়নার মতো। পুবে রেল লাইন। পশ্চিমে বড় রাস্তা। জলের ধারে ধারে, জলজ গুল্ম, বিষকাটারির ঝাড়, নানারকম আবর্জনা ছড়ানো। পশ্চিম ঘেঁষে, শিমূল গাছটার অনেকখানি চোখে পড়ে। নিষ্পত্র, আর কাঁটা ডালপালায় লাল ফুলগুলো বাতাসে মেতে ঝাপটাচ্ছে। সাবারবান লাইনে, আপ আর ডাউনে প্রায়ই ইলেকট্রিক কোচ ট্রেন যাতায়াত করছে। ঘর কাঁপিয়ে শব্দ ভেসে আসছে। ঘর মাঝে মাঝে কেঁপে উঠছে, বড় রাস্তার মালবাহী ভারি ট্রাকের যাতায়াতে। সাইকেল রিকশার পাতিহাঁস প্যাক প্যাঁক কখনও থামে না।

টালির চাল, পাঁচ ইঞ্চি দেওয়াল বড় ঘরটার মধ্যে মেসিন অয়েলের গন্ধ ছাপিয়েও, কম জলের পাঁক আর জলজ গুল্মের গন্ধ ছড়াচ্ছে। দক্ষিণ থেকে মাঝে মাঝে ডালের সম্বরা বা তেল ঝালের ঝাঁজালো ব্যঞ্জনের গন্ধও ভেসে আসছে। পুব দিকের তুটো বড় দরজাই খোলা। গোটানো রয়েছে কোলাপ্সিবল গেট। অনেকখানি জায়গা টিনের শেড দিয়ে ঢাকা। তুটো টুল, কয়েক টুকরো পুরনো ওয়াটার প্রুফ। সাইকেল রিকশার টায়ার গোটা তুয়েক ছড়ানো। সাধারণ সাইকেলের টায়ার না, রিকশার টায়ার। ভারি শক্ত, সিকস্ প্লাই টায়ার। টিনের শেড ঢাকা জমির পরেও কিছুটা খোলা জমির ওপরে বাগান করার একটা চেষ্টা চোখে পড়ে। শীতের গাঁদার শুকনো ঝাড় এখনও বর্তমান। কিছু বেলফুল গাছ, যাদের বাড় থমকে গিয়েছে। পাতাগুলোর গায়ে ধুলো। জল পায় না, চর্যা নেই দেখলে বোঝা যায়। লতানে যুঁইয়ের

ঝাড় শুকনো। কাঠি সার, শীর্ণ। কিন্তু এই ফাল্গুনেও চাল কুমড়োর মাচা সবুজ নধর ডগায় পল্লবিত। এবং কাছাকাছি পুঁইমাচায় পুঁইয়ের কচি ডগা লতিয়ে উঠেছে। কয়েকটা মান কচুর গাছ। তবে ধুলোর আস্তরণ সব কিছুতেই। একদিকে রেল লাইন। আর একদিকে যান চলাচলের রাস্তা। ধুলো নিবারণ অসম্ভব।

সমস্ত জায়গাটিকে ঘিরে আছে বাখারির বেড়া। বেড়ার পুবে ঢালু জমির বুকে বন গাঁদার ঝাড়। নিচে কচুরিপানা, দু এক জায়গায় টুকরো আয়নার মতো জল। রেল কোম্পানির জমি। তারপরে অনেকটা উঁচুতে, রেল লাইন। দুটো আপ আর ডাউন, মেন লাইন। দুটো সাবারবন লাইন। ইলেকট্রিক পোস্ট, আর তারের হিজিবিজি আকাশ জুড়ে।

দেবনাথ ডাইস মেসিনের টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে ওদের দেখছে। ড্রিল মেসিনটা ডান হাতে শক্ত করে চেপে ধরে আছে। যেন লোহার ডাণ্ডা ধরে আছে, চোয়াল শক্ত করে। বড় কালো দু চোখে ক্রুর দৃষ্টি। শুঁয়ো পোকা ভুরু জোড়া কোঁচকানো। অথচ মোটা ঠোঁট জোড়ায় ব্যঙ্গের হাসি। আসলে ব্যঙ্গ না, জ্বলুনি। ওর চোখে যতোটা রাগ, ততোটাই অস্থিরতা। শক্ত মুঠিতে চেপে ধরা ড্রিল মেশিনটা লোহার না হলে, ভেঙে যেতো। মুঠি কাঁপছে। জানে, ও যেখানে দাঁড়িয়ে আছে, উত্তরের গাছতলার ওরা ওকে দেখতে পাচ্ছে না। ওরা বিড়ি টানছে, কথা বলছে। এ পর্যন্ত ঠিক আছে। কিন্তু ওরা হাসছে যেন কোনো পরোয়া নেই। নিশ্চয়ই দেবনাথকে নিয়েই কিছু বলছে আর হাসছে। ও দাঁতে দাঁত পিষে উচ্চারণ করলো, 'বেইমান। বেইমানের দল। আমাকে ট্রেড ইউনিয়ন করা দেখাচ্ছে। দেবনাথ দত্তকে, অ্যাঁ? শ্রমিক আন্দোলন? রেভ্যুলিশন? কিন্তু রিমেম্বার, য়ু বেগারস্—নো, য়ু আর নট প্রোলেটারিয়েট। তোরা ভিখিরির দল, ভিখিরি কখনো রিয়্যাল শ্রমিক আন্দোলন করে না। আই অ্যাম দেবনাথ দত্ত, ডি. ডি, ডোন্ট ফরগেট, আই ওয়াজ এ কমিউনিস্ট।

স্বাধীন ভারতে জেল খেটেছি। আমি শ্রমিক আন্দোলন করেছি—আন্দোলন আর বিপ্লব কাকে বলে, আমি জানি। তোরা জানিস না। তোরা ভিখিরি, উঞ্ছ, আর মস্তান। তোরা রাজনীতি জানিস না। লড়াই করার কায়দা কৌশল জানিস না, সংগঠন করতে জানিস না। লাই পাওয়া কুকুর তোরা, আমাকে আন্দোলন দেখাচ্ছিস?'

দেবনাথ ড্রিল মেশিনটা টেবিলের এক দিকে ছুঁড়ে দিল। জানালা থেকে চোখ সরিয়ে পুবের দেওয়ালের দিকে তাকালো। লেনিনের রঙীন ছবি, কাঁচে বাঁধানো ঝুলছে। সেই গোঁফ দাড়ি, মাথায় টাক, খোঁচা ভুরু আর তীক্ষ্ণ উজ্জ্বল চোখ। গলার সাদা কলারে লাল নেকটাই, কালো কোট। ব্যাকগ্রাউণ্ডে রেডফ্ল্যাগ। দেবনাথের মনে হলো, লেনিন ওর চোখের দিকে তাকিয়ে আছেন। চোখ দেখলেই বোঝা যায়, হাসছেন। দেবনাথও হাসলো। ওর তামাটে মুখে লাল ঝলক দেখা দিল। মনে মনে বললো, 'গাড়লগুলো ভুলে গেছে, লেনিনের ছবিটা আমি টাঙিয়েছি। আমিই ওদের লেনিনের কথা বলেছি—লেনিনের সর্বহারা বিপ্লবের কথা, আমিই বলেছি। ওরা হাঁ করে শুনেছে। কিন্তু বুঝতে পারে নি কিছুই। আমি যেন ওদের রূপকথা শুনিয়েছি। রূপকথা, অ্যাঁ? বিপ্লব রূপকথা? কিছুই বুঝিসনি, হাঁ করে শুনেছিস্। শ্রমিক কৃষক, কমিউনিজম, সংগঠন রূপকথা? উনি মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে এসেছিলেন—ইয়েস—এই আমার মতোই, আর সর্বহারা বিপ্লবের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। আমি কি বলেছি, আমি সর্বহারা বিপ্লবের নেতৃত্ব দেবো? বলি নি, কিন্তু অল্ গাড়লস্, আমার ক্লাস ক্যারেকটার বুঝতে পারে নি। আমি আসলে বিপ্লবীদেরই সঙ্গী, আই অ্যাম এ ন্যাশনাল বুর্জোয়া—শেষ পর্যন্ত আমি বিপ্লবীদেরই সঙ্গী থাকবো—এটা আমার ক্লাস ক্যারেকটার। বাট-অ্যাট দ্য সেম্ টাইম—আই ওয়াজ এ কমিউনিস্ট। নেই, মেম্বারশিপ নেই, সো? আমার একটা পাস্ট আছে, ডোণ্ট ফরগেট। আই লিভ, মিনস্ ইয়ু লিভ, এটাই আমাদের সম্পর্ক। আমি বিগ বুর্জোয়া নই, আমি ওয়ার্কার্সদের সঙ্গে

হাত মিলিয়ে চলি। আমি তোদের নিয়ে বাঁচি, তোরা আমাকে নিয়ে বাঁচিস। তবু আমি মালিক, কিন্তু একজন পুরনো কমিউনিস্ট দিস ইজ এ কোয়ালিটিটিভ চেঞ্জ—গুণগত পরিবর্তন। আমি একটা চসমখোর অর্ডিনারি বিজনেসম্যান নই। আমি টাকা ঢেলেছি, কাজ জানি, কাজ বুঝি। তোরা কাজ করছিস, মজুরি পাচ্ছিস। আমি না থাকলে, তোরা কোথায় আছিস। হ্যাঁ, তোরাও আছিস-আমার জন্যে, মাল বানাচ্ছিস, ঠিক যা পাওনা, তাই পাচ্ছিস। তোরা জানিস, মুনাফা কতো হয়। এটা তো সহজ কথা, আমি মাল যোগাচ্ছি, তা দিয়ে তোরা আর এক মাল তৈরি করছিস, বাজারে বিকোচ্ছে। মুনাফার টাকা তো আমার—আর সেই টাকা দিয়ে, দত্ত ম্যানুফ্যাকচারার্সকে আরো বড় করে তুলতে হবে, বেকার সমস্যার সমাধান করতে হবে—এটা হচ্ছে ন্যাশনাল বুর্জোয়ার কাজ। বাট য়ু অল্ গাড্লস্। তোরা আমাকে টাইট দিতে চাইছিস, লোভী কুকুরের মতো, আরো বেশি টাকা চাইছিস। মজুরি বাড়াবার একটা নিয়ম আছে—তোরা জানিস না। মালের দাম আর বিক্রির সঙ্গেই সেটা বাঁধা, তার এক চুল এদিক ওদিক হবে না। কিন্তু তোরা কি ভেবেছিস। ভেবেছিস, যতো খুশি আংড়ে নিবি। আর আজকাল যারা ট্রেডইউনিয়নের নামে, আখের গোছাবার জন্য মামদোবাজী করছে, তাদের কাছে ছুটছিস্। সবাই মিলে একটা সংস্থাকে ধ্বংস করতে চাইছিস। কিন্তু পারবি না। আমি ডি ডি, আমার একটা পাস্ট আছে। লোকাল লিডারদের সঙ্গে আমার আঁতাত বেশি। তারা জানে, আমি কী। তারা বোঝে, আমার বিজনেসের কী অবস্থা, তারা আমার সঙ্গেই থাকবে। আর তোদের বদলে, আমি নতুন লোক কাজে লাগাবো। তবু, আমি তোদের বোঝাবো —বোছাবার চেষ্টা করবো। না যদি বুঝিস—'

দেবনাথ স্বগতোক্তি থামিয়ে, লেনিনের চোখের দিকে তাকিয়ে, হেসে মাথা ঝাঁকালো। সোজা হয়ে দাঁড়ালো, অনেকটা সামরিক ভঙ্গিতে। উচ্চারণ করলো, কমরেড! ওরা বোঝে না।'…

এ সময়ে, মেয়েলি স্বরের খিলখিল হাসি ভেসে এলো। দেবনাথের হাসি মুখ আবার শক্ত হয়ে উঠলো। ফুলে উঠলো নাকের পাটা। ভুরু কুঁচকে তাকালো পুবের খোলা দরজা দিয়ে। সেখানে কেউ নেই। ওর চোখে সন্দিগ্ধ জিজ্ঞাসা। উত্তরে খোলা জানালার দিকে তাকালো। চার জন বসে আছে। একইরকম ভাবে কথা বলছে, আর হাসছে। দেবনাথ দক্ষিণ দিকে তাকালো। ঐ দিকে আর একটা ঘর। অফিস ঘর। হাসিটা ভেসে এলো দক্ষিণ দিক থেকেই। চেনা হাসি। কার সঙ্গে রঙ্গ, আর এই রঙ্গিনী হাসি? দেবনাথ দাঁতে দাঁত পিষে অস্ফুটে উচ্চারণ করলো, 'উইচ!'

পুবের খোলা দরজা দিয়ে বাতাস আসছে। দেওয়ালের গায়ে ঝোলানো, এক হাসকুটি রূপসী মেয়ের মুখের ছবি-ক্যালেণ্ডার উড়ছে। একটা না, দেওয়ালের তিনটে ক্যালেণ্ডারেই তিনটি মেয়ের ছবি। তার মধ্যে একজনের আবার বুকে কোনো আবরণ নেই। সবগুলোই বাতাসের ঝাপটায় ওলটপালট খাচ্ছে। দু চার জায়গায় ছিঁড়েও গিয়েছে। ঐ শয়তানগুলোই ক্যালেণ্ডারের ছবিগুলো টাঙিয়েছে। ক্যালেণ্ডার দেখার দরকার হয় না। মেয়েদের ছবিগুলো দেখে, আর নিজেদের মধ্যে রসিয়ে মস্করা করে। দেবনাথ অনেক দিন দেখেছে। এই ওদের রুচি। আর এ ঘরে দেবনাথ লেনিনের ছবি টাঙিয়েছে। যে ছবিটার দিকে ওরা কখনও তাকায় না। কিন্তু হঠাৎ ওরা সংগ্রামী হয়ে উঠেছে। মেটিরিয়েলের দাম যখন হু হু করে চড়ছে, খরচা বাড়ছে, তখনই বায়না তুলেছে, মজুরি বাড়াতে হবে। ছেলের হাতের মোয়া! শয়তান ভর করেছে ওদের মাথায়। আর সেই শয়তানটা কে, দেবনাথ ভালোই জানে।

খিলখিল হাসি শুনে দেবনাথ পুবের খোলা দরজার দিকে পা বাড়ালো। কয়েক পা গিয়ে থম্‌কে দাঁড়ালো। সবুজ রঙের বিজলি ট্রেন, দরজায় দরজায় উপছে পড়া যাত্রী নিয়ে খট্‌ খট্‌ শব্দে বেরিয়ে গেল। দেবনাথ চিবিয়ে চিবিয়ে উচ্চারণ করলো, 'লেট দ্য উইচ্‌ লাফ্‌।

আর কত দিন ? বিয়ে ? সে-গুড়ে বালি। দিনকে দিন ছেনালিপনা যে রকম বাড়ছে, কোন্ দিন পেট খসাতেই পালিয়ে যেতে হবে।'... কথাটা শেষ করেই, হঠাৎ যেন সামনে কারোকে দেখে থমকে গেল। আসলে কেউ-ই সামনে এসে দাঁড়ায় নি। দেবনাথের চোখের সামনে ভেসে উঠলো একটি মুখ। সেই মুখের দিকে তাকিয়েই ও থমকে গেল। বিব্রত দেখালো ওকে। একটা ঢোঁক গিলে মুখ নিচু করলো। কল্পিত সেই মুখের দিকে যেন তাকিয়ে থাকতে পারলো না। বিড়বিড় করে বললো, 'তা-তো আমি কী করবো ? আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়। আমার ভালো লাগে না—ঐরকম ধিঙ্গিপনা, তাও ঐ ইতরগুলোর সঙ্গে ।'

দেবনাথের চোখ পড়লো স্বস্তিক চিহ্নের ওপরে। পূবের দেওয়ালে, সিমেন্ট বাঁধানো মেঝে থেকে কয়েক ফুট ওপরে, মেটে সিঁদুরে আঁকা স্বস্তিক চিহ্ন। গত বিশ্বকর্মা পুজোর সময় আঁকা হয়েছিল। ওখানেই পুজো হয়েছিল। প্রত্যেক বছরই হয়। বিশ্বকর্মা পুজোয় দেবনাথ দরাজ হাতে খরচ করে। আর ঐ একটা দিন—শয়তানগুলো যদি বেইমান না হতো, অন্তত ঐ দিনের একটা কারণেই দেবনাথের কাছে ওদের মুণ্ড নামিয়ে রাখা উচিত। ঐ দিন, ও সকলের সঙ্গে রাত্রে মদ খায়। দিশি টিশি না, বিলিতি মদ। নিজের খরচে খাওয়ায়, নিজেও ওদের সঙ্গে বসে বসে খায়। কোনো কারখানার মালিক তা করে ? করে না। দেবনাথ করে কেন ? না, সে হতে পারে মালিক। কিন্তু সে একজন পুরনো দিনের লড়াকু ট্রেড ইউনিয়নিস্ট, সংগ্রামী কমিউ-নিস্ট। সে জেল খেটেছে। সে কি তোদের খালি সামান্য মজুর মনে করে ? তা হলে তো দেবনাথ তোদের কাছে, সাহেব স্যার বা বাবু হতো। দেবনাথদা বা দেবুদা হতো না। ঐ রমেশ মিস্ত্রিরের মতো কারখানার মালিক হতো যে তার কাজের লোকেদের কুকুর বেড়ালের মতো দেখে। খিস্তি আর গালাগাল করে। তবু সবাই রমেশ মিস্ত্রিরকে ভয় পায়। ঐরকম লোক ওদের দরকার। কিন্তু দেবনাথ তা

হতে পারে না। ওর একটা পাস্ট আছে। ও কখনও চাকরি করে নি। কলেজে পড়তে পড়তেই, পার্টিতে ঢুকেছিল। মজুরদের সংগঠিত করেছে। বস্তিতে বস্তিতে ঘুরেছে। আন্দোলন করেছে। কেন? ওর কি কোনো অভাব ছিল? ওকি গরীবের বাড়ির ছেলে ছিল? মোটেই না। ও আদর্শের জন্য লড়েছে। পার্টি যখন বেআইনী ছিল, আণ্ডারগ্রাউণ্ডে চলে গিয়েছিল, আর সেখান থেকে লড়াই করেছে। হতে পারে, আজ ও একটা কারখানা করেছে। কিন্তু বিপ্লবী মনটা তো রয়েছে। সে জন্যই ও কোনো দিন রমেশ মিত্তির হতে পারে নি। কারখানার মজুরদের সঙ্গে ওর দা'দা ভাই সম্পর্ক। আর, কাল কা য়োগী—ঐ ওঁচার দল, ওকে মজুরি বাড়াবার আন্দোলন দেখাতে এসেছে।

দেবনাথ ট্রাউজারের পকেট থেকে স্যাকা তামাকের সিগারেটের প্যাকেট বের করলো। হিপ্ পকেট থেকে গ্যাস-লাইটার বের করে সিগারেট জ্বাললো। পশ্চিমের দেওয়ালের গায়ে দাঁড় করানো কোরা বডি দুটোর দিকে তাকালো। কোরা কাপড় বলতে যে-রকম বোঝায়, সেইরকম। নতুন। কোরা বডি হলো, সাইকেল রিক্সার কাঠের আসল বডি তুন্—আসলে যার নাম ঘোড়া নিমের কাঠ। কাঠ চেরাইয়ের কারখানা থেকে তৈরি হয়ে আসে এই কোরা বডি। কোরা বডি অ্যালুমিনিয়াম দিয়ে মোড়া হয়। দুটো কোরা বডির কাছেই পড়ে আছে, চটের ওপর অ্যালুমিনিয়ামের ডাঁই করা শিট। রয়েছে টিনের পাতও। টিনের পাত দিয়ে মুড়লে খরচ কম। তবে কোরা বডি অ্যালুমিনিয়ামের পাত দিয়েই মুড়তে হয়। না হলে, টিনে জং ধরে চেহারা খারাপ হয়ে যায় তাড়াতাড়ি। পা রাখবার জায়গাটা অবিশ্যি বেশির ভাগ টিনের পাত দিয়েই মোড়া হয়। সেরকম অর্ডার পেলে, অ্যালুমিনিয়ামেও মোড়া যায়। ফ্যান্সি রিক্সার অর্ডার পেলে তো কথাই নেই। রবার ক্লথও পেতে দিতে হয়। সব ডাঁই হয়ে পড়ে আছে। দুটো কোরা বডি ছাড়াও রয়েছে, একটা মাল টানা রিক্সার কাঠের পাটা-

তন। আর একটা কাঠের পাটাতন রয়েছে, স্কুলের রিক্সা ভ্যানের জন্য। কলকাতার বাইরে আজকাল বিস্তর ইংলিশ মিডিয়ামের কে জি স্কুলের ছড়াছড়ি। বাচ্চাদের স্কুলে নিয়ে যাবার জন্য পালকির মতো রিক্সা ভ্যান চালু হয়েছে। পুরোপুরি চারটি মালের অর্ডার রয়েছে। দুটো রিক্সা। তার মধ্যে একটা ফ্যানসি। যাবে সোনাবপুর, এক বিড়ির কারখানার মালিকের কাছে।

দেবনাথ সিগারেট টানতে টানতে, দেওয়ালে আলমারির কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। পাতলা পিতলের পাতগুলো সোনার মতো ঝকঝক করছে। একটা পাতের ওপর পেখম খোলা ময়ূর আঁকা। আর কয়েকটা ফুল। রঙীন রেকসিনের টুকরো। লাল নীল পুঁতি। এসবই রিক্সার গায়ে ডেকরেশানের জন্য। ফ্যান্‌সি রিকশা যাকে বলে। মাথার ওপরে হুডের ওয়াটার প্রুফ কাপড়ের সঙ্গে, লটকে দেওয়া হয় রঙীন কাপড়ের ঝালর। রঙীন কার্পেট দিয়ে মোড়া হয় বসবার সীট। পিতলের পাত কেটে রিকশা মালিকের নামও লিখে দেবার অর্ডার থাকে। কাতান পড়ে আছে এক পাশে। পিতলের পাত কাটার ধারালো কাতান।

দেবনাথ সরে এসে তাকালো বাখারিগুলোর দিকে। সবে মাত্র আলকাতরা মাখানো হয়েছে। বাঁশের বাখারি দিয়েই তৈরি হয় হুডের খোল। তৈরি করে গ্রামের বিশেষ এক শ্রেণীর কারিগর। বাখারির ওপরে ওয়াটার প্রুফ কাপড় পেরেক মেরে লাগানো হয়। দুটো রিকশার বাখারি সেট, চারটে চেসিস, সব জায়গায় জায়গায় স্তূপাকার হয়ে পড়ে আছে। দুরকমের চেসিস। অর্ডিনারি রিকশার একরকম। মাল ভ্যান আর ইস্কুল ভ্যানের আর একরকম। এগুলো একটু বেশি ভারি, চওড়া।

কী নেই? যাবতীয় মাল পড়ে আছে। সাত দিন আগে দেবনাথ কলকাতা থেকে এই সব মাল কিনে এনেছে। বেন্টিংক স্ট্রিট আর বাগরি মার্কেট চষে বেড়িয়ে, টেম্পোতে করে নগদ দামে মাল কিনে

এনেছে। রেট পাইকেরি। কারবার নগদ ছাড়া নেই। রেকসিন, ফোম, কার্পেট। সীটের চট, ছোবড়া, স্পঞ্জ। স্পঞ্জের দরকার হয় গোঁজা দিতে। চটের ভিতর ছোবড়া ভরে, স্পঞ্জের গোঁজা দিয়ে সেলাই। তার ওপরে খরিদ্দারের অর্ডার মাফিক রেকসিন, ফোম, কিংবা প্লাস্টিক। অবিশ্যি আজকাল প্লাস্টিক অচল হয়ে যাচ্ছে। পাতলা রেকসিনে মোড়া সিকস প্লাই টায়ার টিউব একপাশে জড়ো করা। স্পোকলাগানো রিম্। নতুন, ঝকঝক করছে। অ্যাকসেল, হেভি ডিউটি চেন। সাধারণ সাইকেলের চেন না। রঙের কৌটো, ব্ল্যাক জাপান, আর সিলভার। বাখারিতে রূপোলি ডোরা আঁকা হবে। আর রকমারি হাতল। অনেক তার নাম। বাবু বডি, ডিম বডি, মধুমতী, গঙ্গা, যমুনা। গঙ্গা যমুনা সব থেকে বড়। হেভি স্প্রিং, যার ওপর গোটা বডি দাঁড়িয়ে থাকে।

দেবনাথ সিগারেট টানতে টানতে, ঘুরে ঘুরে সব দেখতে লাগলো। নিকেল আর পিতলের মাডগার্ড, হ্যাণ্ডেল, চালকের সীট, ওয়াশার, ল্যাম্প ব্র্যাকেট, ব্রেক সেট, গীয়ার, প্যাডেল, জাম নাট্, সব থরে থরে সাজানো পড়ে আছে। ধুলো জমছে। গত সাত দিন কাজ বন্ধ। ইতিমধ্যে আরও একটা রিকশার অর্ডার এসেছিল। দেবনাথ নিতে সাহস পায় নি। চারটে মালের অর্ডার, গলার কাঁটা হয়ে বিঁধে আছে। মেটে-রিয়েল পড়ে আছে, কাজ হচ্ছে না। আজ পর্যন্ত খদ্দেরদের কাছ থেকে কখনও আগাম টাকা নেয় নি। সেটা একটা ভাগ্য। ও ঠিক চালিয়ে নিয়েছে। আগাম নেওয়া মানেই, নিজেকে বাঁধা রাখা। মাল পুরো-পুরি রেডি করবো। চালিয়ে দেখে নাও। পুরো পেমেণ্ট কর। ক্যাশ দাও, চেনাশোনা পার্টি হলে, চেকও চলতে পারে। কিন্তু ধারে কার-বার নেই। অথচ এই স্তূপাকার মাল পড়ে আছে। পড়ে থাকা মানে, মরে থাকা। 'অল ডেড'—দেবনাথের ভাষায়। প্রত্যেকটি পার্টস্ অ্যাসেম্‌বল্‌ড হবে, গাড়ি তৈরি হয়ে যাবে। তখন একটা সচল জিনিস গড়ে উঠবে। প্রাণ পাবে। এই সব ছোট বড় সব মেটেরিয়েল,

মানুষের শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মতো। জুড়ে দাও, গেঁথে দাও, পোশাক জড়াও। ফিনিশ্‌ড মাল, জীবন্ত আর চলমান একটা প্রাণীর মতো।

দেবনাথ ঘরের দক্ষিণের কোণে গিয়ে দাঁড়ালো। চোখের দৃষ্টি অন্যমনস্ক। ও প্রথম প্রথম ফুরনে কাজ করাতো। সব কাজেই, আলাদা আলাদা মিস্তিরি, মজুর। রোজ কাজ, রোজ টাকা। ফুরনের চুক্তি মতো কাজ শেষ কর। টাকা নিয়ে চলে যাও। কোনো উদ্বেগ নেই, অস্বস্তি নেই, ঝামেলা নেই। দত্ত ম্যানুফ্যাকচারার্সের হাতে অর্ডার নেই। কাজও নেই। তুমি মিস্তিরি হও, বেকার বসে থাকো। দেবনাথের সঙ্গে কোনো দেওয়া নেওয়া নেই। ঝাড়া হাত পা।

এককালে—শুরুতে, এইভাবেই কাজ করে দেবনাথ ব্যবসা দাঁড় করিয়েছিল। কাজে ফাঁকি ছিল না। কাজে ফাঁকি এখনও নেই। যার যেমন অর্ডার, ঠিক সেইরকম ডেলিভারি। খদ্দের খুশি। বাজারে সুনাম এমনি হয়নি। কিন্তু কবে এক সময় থেকে মাথায় ভূত চাপলো ফুরনে আর কাজ নয়। রোজের হিসাব যোগ করে, মাস মাইনে চালু করেছিল। স্বপ্নও দেখেছিল, রিকসা তৈরির কারখানা ভবিষ্যতে হয়ে উঠবে মোটর মেরামতের কারখানা। রিকসা যতো বাড়ছিল, কলকাতার বাইরে এইসব শিল্পাঞ্চলে মোটর গাড়িও ততো বাড়ছিল। একদিকে রিকশা আর রিকশা ভ্যান তৈরি হবে। আর এক দিকে মোটর মেরামতি কারখানা। নামও ভেবে রেখেছিল। ডাট্ অটোমোবিলস্ অ্যাণ্ড ম্যানুফ্যাকচারার্স। রোজের টাকা, হপ্তার টাকা, কেমন যেন ছোটখাটো, শোনাতো। বড় কারখানার মতো, মাস মাইনে চালু করতে না পারলে কেমন যেন ছোটখাটো, পাঁতি ব্যবসার মতো মনে হয়েছিল। তবে হ্যাঁ, মাস মাইনে মানেই রোজের তুলনায় কিছু কম হবেই। কাজ না থাকলেও মাইনে গুনতে হবে। হপ্তায় একদিন ছুটি দিতে হবে। পূজা পালপার্বণেও ছুটি। রোজের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া যায় না। রমেশ মিস্তির চালাক লোক। সে কখনও ফুরনে ছাড়া কাজ করে না। একটা বডি করতে যা রেট তাই পাবে। আট ঘণ্টার জায়গায় দশ

ঘণ্টা খাটো। বারো ঘণ্টা খাটো। চার ঘণ্টাই খাটো না। কাজ পাওয়া নিয়ে কথা। কাজ শেষ, বাজিয়ে দেখে নেয়। টাকা নিয়ে চলে যাও।

দেবনাথ সিগারেটে শেষ টান দিয়ে, মেঝেয় ফেললো। চপ্পল দিয়ে চেপে দিল। দু হাতের মুঠি শক্ত হয়ে উঠলো। শিরাগুলো ফুলে উঠলো। স্বপ্ন—অ্যাঁ, স্বপ্ন দেখেছিল ও বড় কারখানার মতো সব ব্যবস্থা চালু করবে? তার সঙ্গে আবার মোটর মেরামতির কারখানা। কলকাতার বড় বড় কোম্পানির মতো গ্যারাজ। কোম্পানি অ্যাকট্ মাফিক বিজনেস করবে। শ্রমিকদের প্রভিডেন্ট ফাণ্ড দেবে, গ্র্যাচুয়িটি দেবে। স্বপ্ন, অ্যাঁ? ঐ সব বিশ্বাসঘাতকদের দল নিয়ে।

আবার সেই খিল খিল হাসি ভেসে এলো। দেবনাথ পুবের খোলা দরজার দিকে তাকালো। চোয়াল শক্ত হয়ে উঠলো। সরে গিয়ে, উত্তরের খোলা জানালার দিকে তাকালো। গাছতলায় সেই চারজন বসে আছে। কথা বলছে, হাসছে। বাকি চারজন কাছে পিঠেই কোথাও আছে নিশ্চয়। পাহারা দিচ্ছে। যেন ফুরনের মিস্তিরি-মজুরদের ডেকে কাজ চালু করা না যায়।

একটা আপ ট্রেন ঝম্ ঝম্ শব্দে বেরিয়ে গেল। দেবনাথ আবার একটা সিগারেট ধরালো। কার সঙ্গে এই রঙ্গ আর রঙ্গিণী হাসি হচ্ছে? বাঘের মতো চাপা গরগর শব্দে উচ্চারণ করলো, 'ঐ বুক পাছা নাচানো গতর একদিন কুকুরেরা ছিঁড়ে খাবে। হ্যাঁ, কতগুলো ঘেয়ো উপোসী কুকুর। তার আগে, আমি…।'

দেবনাথের স্বর ডুবে গেল। যেন সামনে কারোকে দেখে, আচমকা ভয়ে আর লজ্জায় থতিয়ে গেল। অথচ সামনে কেউ নেই। ও নিজেই মার খাওয়া কুকুরের মতো, ডাইস্ মেশিন টেবিলটার কাছে সরে গেল। ফিস্ ফিস্ করে বললো, 'আমার মাথার ঠিক নেই। রাগের চোটে মুখ ফসকে কথাটা বেরিয়ে পড়েছে। সত্যি, মাইরি।'....ও কাপুরুষের মতো চাটুকারের হাসি হাসলো।

পুবের খোলা দরজা দিয়ে জোড়া প্রজাপতি ঢুকলো ঘরের মধ্যে।

একটার পিছনে আর একটা যেন জুড়ে গিয়েছে। দেবনাথ দেখলো। জাম রঙ ঢাকাই জামদানির আঁচলের নকশার মতো পতঙ্গ দুটোর রঙ। কী চায় ওরা এখানে? বাতাসের ঝাপটায় ঢুকে পড়েছে। প্রায়ই এরকম ঢোকে। ও দেখলো, প্রজাপতি দুটো অস্থির পাখায় উড়ে, পিতলের মাডগার্ডের ওপরে চকিতের জন্য বসলো। আবার উড়লো। সিক্স প্লাই টায়ারগুলোর গায়ে পাখা ছুঁইয়ে, উড়ে গেল ব্ল্যাক জাপানি রঙের কৌটোর মুখে। আবার উড়লো। স্তুপাকার সব মেটেরিয়াল পার্টসের গায়ে পাখা ছুঁইয়ে, উড়ে গেল উত্তরের জানালার কাছে। বেরিয়ে গেল জানালার বাইরে। রাস্তা দিয়ে গর্জন করে বাস চলে যাচ্ছে। সহিসের চিৎকার শোনা যাচ্ছে। এ ঘরটা কাঁপছে। দেবনাথের চোখে আবার অন্যমনস্কতা নেমে এলো। ঠোঁটে চেপে ধরা সিগারেট কাঁপছে। ও ডাইস মেশিন টেবিলের কাছ থেকে সরে এসে, ঘরের চারদিকে স্তুপাকার মেটেরিয়াল পার্টসগুলোর দিকে দেখতে লাগলো। 'ডেড'। মনে মনে বললো। মুখটা আবার শক্ত হলো। এখন নিজের আঙুলগুলো চিবিয়ে ছিঁড়ে খেলেও, শোধরাবার উপায় নেই। ফুরনের মিস্তিরি মজুরদের ডেকে এনে, কাজ করানো যাবে না। অথচ শুরুতে, ফুরনে কাজ করিয়েই, ও ভালো লাভ করেছে। আরও সাত কাঠা জমি কিনেছে। নিজের আলাদা বাড়ি করেছে।

এখান থেকে, পশ্চিমে, মাইলখানেক দূরে দেবনাথের পৈতৃক বাড়ি। বাড়ি বাগান পুকুর, সব মিলিয়ে বিঘে খানেক জমি। ওর দাদাদের ধারণা ছিল, ও চিরকাল রাজনীতি করবে। ধারণার কারণ, তাদের বিশ্বাস ছিল, দেবনাথ একটা বোকা উল্লুক। অবিশ্যি পার্টিও তাই ভাবতো। জেল থেকে বেরিয়ে ও লোকাল কমিটির মেমবার হতে পারবে ভেবেছিল। লোকাল কমিটি থেকে এক দিন জেলা কমিটিতে যাবে, কল্পনা করতো। তারপর পার্টির নমিনেশন পেয়ে এম. এল. এ। ক্ষমতায় যেতে পারলে অন্তত রাষ্ট্রমন্ত্রী। কিন্তু লোকাল কমিটিতেই যেতে পারে নি। বরং পার্টি চেয়েছিল, ও একজন সাধারণ সদস্যই

থাকবে। শ্রমিকদের মধ্যে কাজ করবে। পার্টি সংগঠন বাড়িয়ে তুলবে। উনপঞ্চাশের যতো ভুলের আবর্জনা সাফ করে, নতুন নীতি আর কৌশলে পার্টিকে চাঙা ক'রে তুলতে হবে। অথচ ভিতরে ভিতরে পার্টির নীতি আর কৌশল নিয়ে মতবিরোধ শুরু হয়ে গিয়েছিল। দেবনাথ দেখছিল, ওর বয়স পেরিয়ে গিয়েছে তিরিশ। পার্টি ওকে মোটেই তেমন আমল দিচ্ছিল না। দেবার কোনো কারণও ছিল না। ওর সে যোগ্যতা ছিল না। থাকলে, ও নিজেই নিজের আসন পাকা করে নিতে পারতো। উল্টে, ওকে সবাই কেমন ঠাণ্ডা কাঁধ ধাক্কা দিচ্ছিল। বিশেষ করে, যখন লোকাল কমিটিতে দাঁড়াতে চেয়েছিল। ও ক্রমে হতাশ হয়ে পড়ছিল। পার্টি থেকে সরে এসেছিল আস্তে আস্তে। জেলে থাকতেই বাবা মারা গিয়েছিলেন। দাদা বউদিরা করুণা করতো। রোজগার ছিল না। বিয়ে করার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও, করতে পারছিল না। কিন্তু প্রেম করছিল।

পূর্ববঙ্গের দেশ ছাড়া মেয়ে সুমতি। দেবনাথের পাড়ায়, একটা বিশাল পোড়ো বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল গোটা কয়েক মধ্যবিত্ত পরিবার। জবর দখল বাড়ি। তার মধ্যে এক পরিবার, হরমোহন চক্রবর্তী। এক ছেলে চটকলে মিস্তিরের চাকবি যোগাড় করতে পেরেছিল। আর এক ছেলে রেলের ওয়াগান লুটে হাত পাকিয়েছিল। সংসারেও কিছু টাকা পয়সা দিত। বৃদ্ধ হরমোহন সারাদিন ঘরে বসে থাকতেন। আর স্ত্রীর গঞ্জনায় ভুগতেন। দুই ছেলের পর দুই মেয়ে। বড় সুমতি। ছোট মিনতি। দেবনাথ সুমতিকে প্রথম যখন দেখেছিল, তখন ওর বয়স কুড়ি একুশ। মিনতি অনেক ছোট দশ বারোর বেশি ছিল না।

সুমতির রঙ ফরসা, একটু দোহারা গড়ন। ডাগর কালো চোখ, নাকটিও নেহাত বোঁচা ছিল না। পুষ্ট ঠোঁট দুটিতে কেমন মিটমিটে হাসি লেগেই থাকতো। এক মাথা চুল, স্বাস্থ্যটি উজ্জ্বল। একটু বা উদ্ধতই। এমন মেয়ের প্রেমিকের অভাব ছিল না। অনেক ছেলেই

ঘুর ঘুর করতো। দেবনাথও ঘুরঘুর করতো। সুমতি দেখেশুনে, দেবনাথকেই প্রশ্রয় দিয়েছিল বেশি। সুমতির মাও দেবনাথকে বেশি খাতির করতেন। সুমতিই প্রথম দেবনাথকে জীবন আর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সচেতন করেছিল। দেবনাথ কি চিরকাল দাদাদের ঘাড়ের বোঝা হয়ে থাকবে নাকি? ওসব রাজনীতি করার কথা চিন্তা করে কী লাভ? চাকরি জুটছে না? ব্যবসা তো করা যায়। টাকা? দেবনাথ যদি কোনো ব্যবসার কথা ভাবে, তা হলে বাড়ির নিজের অংশ বিক্রি করে দিয়ে টাকা যোগাড় করতে পারে।

সুমতিই প্রথম মন্ত্রণা দিয়েছিল। বাড়ির অংশ বিক্রি করে দিলে, তৎক্ষণাৎ বাড়ি ছাড়তে হবে? ছাড়বে। সুমতিদের সঙ্গেই কোনো-রকমে মাথা গুঁজে থাকবে। না থাকতে চাইলে, একটা এক ঘরের ছোট বাসা ভাড়া নিলেই হবে। ব্যবসা করে দাঁড়াতে পারলে, ভবিষ্যতে সব কিছুই মিলবে। দেবনাথ রমেশ মিত্তিরের রিকশা তৈরির কারখানা দেখেছিল। কাজ কারবারের ধাঁচ, লাভ লোকসান, সব খতিয়ে দেখেছিল। সুমতিকে বলেছিল। সুমতি এক কথায় সায় দিয়েছিল, 'লেগে পড়।'

দেবনাথ লেগে পড়েছিল। শহরে চেনাশোনা কারবারি বন্ধুর অভাব ছিল না। রমেশ মিত্তিরের শত্রুরও অভাব ছিল না। ভালো কারবার। লাগাতে পারলে, জমে যাবে। একলা রমেশ মিত্তির কেন রিকশা ম্যানুফ্যাকচার করবে। সিদ্ধান্ত নিয়েই, আগে বড় রাস্তা আর রেল লাইনের ধারে এ জায়গা দেখা হয়েছিল। দেবনাথ বাড়ির অংশ বিক্রি করবে শুনে দাদারা ফাঁপরে পড়েছিল। ভেবেছিল, বোকাটার মাথায় এ পোকা কে ঢোকালো? নিশ্চয়ই ঐ বাঙাল বামুনদের মেয়েটা? দেখতে শুনতে ভালো, চালাক চতুর বুদ্ধিমতী মেয়ে। মেয়ের মন্ত্রণা, বড় সাংঘাতিক মন্ত্রণা। দাদারা ঝটিতি সিদ্ধান্ত নিয়ে, নিজেরাই দেবনাথের অংশ কিনে নিয়েছিল। মূল্য দিয়েছিল তিরিশ হাজার টাকা। টাকা পেয়েই প্রথম একটি বাসা ভাড়া। তারপরে

সুমতিকে বিয়ে। বিয়ের পরেই জমি কিনে, প্রথম এই ঘর তোলা হয়েছিল। বছর না ঘুরতেই, ব্যবসার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ দেখা দিয়েছিল। দু বছরে, লাগোয়া দক্ষিণের ঘরটা তুলেছিল। এখন যেটা অফিস। আসলে ভাড়া বাড়ি ছেড়ে, সুমতিকে নিয়ে ঐ দক্ষিণের ঘরেই উঠেছিল। একটা ঘর, একটা স্যানিটারি প্রিভি, লাগোয়া চানের ঘর।

বারো বছরের মধ্যে বিস্তর পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে। দেবনাথ আরও জমি কিনেছে। দক্ষিণে আলাদা বাড়ি করেছে। কারখানার সঙ্গে দু কাঠা ফারাক রেখে। ইতিমধ্যে সুমতির বাবা মা'র স্বর্গপ্রাপ্তি ঘটে গিয়েছে। দাদারা যে-যার মতো। মিনতিকে সুমতি নিজের কাছে এনে রেখেছে। সব দিকেই উন্নতি হয়েছে। ফাঁক থেকে গিয়েছে একটা জায়গা। সুমতির কোনো ছেলেমেয়ে হয় নি। ওকে দেখলে, এখনও সেই কুড়ি একুশ বছরের মেয়ের মতোই মনে হয়। কিন্তু জীবনের অভিজ্ঞতা তাকে সমীহ করার মতো ব্যক্তিত্ব আর বুদ্ধি দিয়েছে। কেবল সংসারের দায়িত্বই তুলে নেয় নি। দেবনাথের ব্যবসারও সে উপদেষ্টা। টাকা পয়সার চুলচেরা হিসাব তার কাছে। গহনাগাটি পরার শখ নেই। কিন্তু গড়িয়ে জমা করার ঝোঁক আছে। সাজগোজের ঠাট বাট নেই। জীবনে কোনো দিন কুঁচিয়ে শাড়ি পরে নি। তা সে যতো দামের শাড়িই হোক, আটপৌরে ধরনের সজ্জা বজায় রেখেছে। বই পড়ার বাতিক আছে। মাঝে মধ্যে সিনেমা থিয়েটার দেখতে যায়। তাও খুব কম। তার ব্যক্তিত্বের কাছে, দেবনাথ খাটো মাপের মানুষ। সুমতিকে ও মান্য করে। মনে মনে ভয়ও পায়। একমাত্র মাত্রারিক্ত মদ খেয়ে, মেজাজ খারাপ থাকলে, যা মুখে আসে, সুমতিকে তা-ই বলে। সুমতি তখন একটা কথাও বলে না। তারপরেও বলে না। কারণ দেবনাথই খোয়ারি কাটবার পরে, সুমতির কাছে মাথা নিচু করে যাই। ল্যাজ নাড়ার ভঙ্গিতে, চাটু বাক্যে মান ভাঙাবার চেষ্টা করে। সুমতি ছেলে ভোলানোর মতো হেসে বলে, ন্যাকামি যথেষ্ট হয়েছে। যাও, অনেক কাজ পড়ে আছে,

কাজ করোগে। এখন থেকে বেশি ঐ ছাই পাঁশ গিললে, বোতল-গুলো সব ভেঙে চুরে দেবো, তারপরে যেদিকে দুচোখ যায়, চলে যাবো।'

চলে যাবার কথাটা সুমতি অনেকবারই বলেছে। যায় নি। কিন্তু দেবনাথ মোটেই সুমতির কথাটাকে কথার কথা মনে করে না। মনে ভয় থেকেই যায়, সুমতি যদি সত্যি চলে যাবে বলে স্থির করে ওকে আটকানো কঠিন হবে। সে জন্য ও মাথা নত করে জোড় হাতে বলে, 'আর যাই কর, আমাকে ফেলে চলে যেও না। আমি ধনে প্রাণে মারা যাবো।'

সুমতি ছেলেমানুষকে আদর করার মতো, দেবনাথের গালে ঠোনা মারে, 'এত যদি ভয়, মদ খেয়ে বীরত্ব কেন? যাও, কাজ করো গে।'

দেবনাথ বুকে ভরসা আর বল পায়। মিনতি সুমতির বিপরীত। রঙটা তেমন ফরসা না। লজ্জা একটু বেশি। দেখতেও সুমতির থেকে রূপসী। কথায় কথায় হাসি, যাকে বলে ঢলানি। যতো সাজগোজের বহর, ততো বাইরের হাতছানি। পারলে বোধহয় রোজই সিনেমা দেখে। মিনতির বেলায় সুমতি সব সময় দরাজ। সুমতির মতো দিদি কী করে মিনতিকে প্রশ্রয় দেয়, দেবনাথের মাথায় ঢোকে না। কারখানার মিস্তিরি মজুরদের ও বউদি। সবাই ওকে সমীহ করে। কেউ কোনো রকম বেচাল করে না। সুমতিও সকলের সঙ্গে, আপনজনের মতো হেসে কথা বলে। মাঝে মাঝেই এটাসেটা করে খাওয়ায়। যেন একটা বড় পরিবারের নিপুণা গৃহকর্ত্রী। ওর আচরণে কোথাও বিন্দুমাত্র বেচাল নেই। বরং দেবনাথের সামনে ওরা যেটুকু বা হাসি ঠাট্টা করে, সুমতিকে দেখলে মুখে একেবারে কুলুপকাটি। আর সুমতি একটু হাসলে, ওরা গলে যায়। অথচ বেচালই যার চাল, সেই মিনতিকে সুমতি একটা কড়া কথা বলে না। কোনো বিষয়ে বাধা দেয় না। বরং প্রশ্রয়টাই চোখে পড়ে। দেবনাথ নিজেও কি মিনতির প্রতি একটু

দুর্বল না? আসলে পুরুষ হিসাবে, ও মানুষটাই দুর্বল। মনে করে, মিনতির ওপর ওর একটা অধিকার আছে। মিনতি যখন অন্য পুরুষের সঙ্গে হেসে ঢলে কথা বলে, ওর বুকে জ্বালা ধরে। ওর সঙ্গে বললে, খুশি হয়। মিনতি তো ওরই আশ্রিতা। ওরটাই খায় পরে। অতএব, মিনতির ওপর এক এক সময় ওর আকর্ষণ যখন দুর্নিবার হয়ে ওঠে, একটা অন্ধ আবেগে বুকে চেপে পিষ্ট করতে ইচ্ছা করে। আর সেটা গোপন করার ক্ষমতাও ওর থাকে না। এবং আশ্চর্য, সুমতি সেইসব মুহূর্তে, একটা অলৌকিক দৈবের মতো আবির্ভূত হয়। সুমতি মুখে কিছুই বলে না। কেবল কঠিন অপলক চোখে দেবনাথের চোখের দিকে তাকায়। দেবনাথ কুকুরের মতো ল্যাজ গুটিয়ে পালায়। আরও আশ্চর্য, সুমতি পরে, কোনো সময়েই ওকে সেই বিষয়ে কিছু জিজ্ঞেস করে না। বলেও না। ওর ভিতরে থাকে একটা আড়ষ্ট হীনমন্যতা। মিশে থাকে ভয়। যে কারণে, মিনতির বিরুদ্ধে সুমতিকে কোনো নালিশ জানাতে পারে না। অন্য আর এক চিন্তা, মিনতি কোনো দিন এ সংসার ছেড়ে চলে যাবে, দেবনাথ মনে প্রাণে তা চায় না।

সাত দিন আগে, সকালবেলা মজুরি বাড়ানোর কথা উঠেছিল। দেবনাথ তার আগের দিন রাত্রেও জানতে পারে নি, শয়তানগুলো এরকম একটা মতলব ফেঁদেছে। প্রথমে কথাটা শুনে ও অবাক হয়েছিল। তারপরে ভেবেছিল, দেবনাথের সঙ্গে ওরা মজা করছে। দেবনাথ হেসে বলেছিল, 'কাজের সময় ইয়ার্কি ভালো লাগে না। অনেক কাজ জমে আছে, কাজে লেগে পড়।'

'আপনার সঙ্গে আমরা ইয়ার্কি করি না, দেবুদা।' পালের গোদাটা মুখ গম্ভীর করে বলেছিল, 'এটা ইয়ার্কির কথাও না।' দু তিন মাস ধরেই ভাবছি কথাটা বলব। ফুরনের হিসেব করেও দেখেছি, আমাদের মাস মাইনে অনেক কম। একটা বডি করলে, একজন মিস্তিরি পায় পনরো টাকা। আমরা যারা বডি মিস্তিরি, মাস মাইনের হিসেবে একটা বডির জন্য আট ন' টাকার বেশি পাই না। অথচ কাজ করি

কম করে দশ ঘণ্টা। এভাবে চলতে পারে না। আপনি হিসেব নিয়ে বসুন। মাসে ক'টা মাল ফিনিশ হয়, আর তার মজুরির পড়তা কী পড়ে, দেখুন।

দেবনাথ শুনছিল, আর ভিতরে ভিতরে ফুঁসছিল। তারপরে চিৎকার করে উঠেছিল, 'কিছু দেখবো না। ও সব হিসেব টিসেব আমাকে শোনাতে আসিস না। মাইনে বাড়ানো? ছেলের হাতের মোয়া? মামদোবাজী? কী জন্যে মাইনে বাড়াবো? আমার লাভ বেড়েছে? কোনো পার্টস্‌য়ের দাম কমেছে?

'সবই জানি দেবুদা।' পালের গোদাটা বলেছিল, 'আপনার মাল পিছু লাভ বাড়ে নি, কিন্তু কাজ বেড়েছে। মাসে আজকাল কম করে ষোল সতেরটা ফিনিশ মাল তৈরি হচ্ছে। সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে আপনার আয় বেড়েছে। একটু আমাদের মুখের দিকেও দেখুন। আমরা আপনার কাছে চেয়ে নিচ্ছি।'

দেবনাথ হুংকার দিয়েছিল, 'চাইলেই দুনিয়ায় সব পাওয়া যায় না। কারোর মুখ দেখবার দরকার নেই আমার। যা মাইনে পাচ্ছিস, তাতে পোষায় কাজ কর, নয় তো চলে যা। মিস্তিরি মজুরের অভাব নেই। আমি ফুরনে কাজ করাবো।'

'তা আমরা করতে দেব না।' পালের গোদাটা বেশ শক্ত গলায় বলেছিল, 'কোনো মিস্তিরি মজুরকে আমরা এ কারখানায় ঢুকতে দেবো না। আমাদের কাজ আমরাই করব, মজুরিও বাড়াতে হবে।'

দেবনাথের তামাটে মুখ, বড় চোখ দুটো লাল হয়ে উঠেছিল। খানিকটা অবাক সুরেই বলেছিল, 'ও! আন্দোলন ফলানো হচ্ছে? সংগ্রাম? মজুরি বাড়ানোর আন্দোলন? দেবনাথ দত্তকে শ্রমিক আন্দোলন দেখানো হচ্ছে? যে শ্রমিক আন্দোলন করে স্বাধীন ভারতে জেল খেটে এসেছে!'

'সে আপনি কী করেছেন না করেছেন, আপনি জানেন।' পালের গোদাটা একলাই কথা বলে যাচ্ছিল, 'ও সব কথা অনেকবার

শুনিয়েছেন। তাতে আমাদের পেট ভরে না। আমরাও মজুর মিস্তিরি মানুষ। চার বছরের মধ্যে আপনি আমাদের একটা পয়সাও মাইনে বাড়ান নি। সব জিনিসের দাম বেড়েছে। আমাদের খেয়ে পরে বাঁচতে হবে তো। এই নিন, আমাদের দরখাস্ত। ওতেই লেখা আছে, কার কী হারে মাইনে বাড়াতে হবে।'

দেবনাথ ছোঁ মেরে কাগজটা নিয়ে, দলা পাকিয়ে ছুঁড়ে দিয়েছিল ঘরের এক কোণে, 'নিকুচি করেছে দরখাস্তের। বেরিয়ে যা সব আমার সামনে থেকে। বেরো।'

সব থেকে বয়স যার বেশি, মিস্তিরি হারু ফেসো গলায় হেসে উঠেছিল, 'বেরিয়ে তো যাব গো বাবু। তবে তুমি মজুর আন্দোলন করে জেলে গিছলে, এ বারফট্টাই আর করো না।'

'মানে? আমি জেলে যাই নি?' দেবনাথ ক্ষেপে উঠেছিল।

হারু বলেছিল, 'গিছলে, কিন্তু তুমি আসলে ওসব কিছু নও বাবু। মজুর আন্দোলন করলে, কেউ এরকম কথা বলে না। তোমার জেলে যাবার গপ্‌পোটা এখন বারফট্টাই বলে মনে হয়। তুমি যে কী মাল, সরকার জানলে, তোমাকে জেলে বসিয়ে খাওয়াত না। আমাদের বের করে দিচ্ছ দাও, কিন্তু তোমার দত্ত কোম্পানির কারখানা চলবে না।'

দেবনাথ কিছু বলার আগেই, সবাই বেরিয়ে গিয়েছিল। ও দাঁতে দাঁত চেপে বলেছিল, 'বেইমানের দল। ট্রেটারস্। ভাত ছড়ালে কাকের অভাব? আমাকে মজুর আন্দোলন দেখাতে এসেছে?...ও দরজা জানালাগুলো ধাঁই ধাঁই শব্দে বন্ধ করে দিয়েছিল। কিন্তু ক্ষেপে উঠলেও ওর চোখে মুখে কেমন একটা বিস্ময়ের অভিব্যক্তি ছিল। কারণ সমস্ত ব্যাপারটাই ওর কাছে অভূতপূর্ব, অপ্রত্যাশিত ছিল। ভাবতেও পারে নি, ওরা মাইনে বাড়াবার দাবী করতে পারে। কারখানা অচল করে দেবার ভয় দেখাতে পারে। দরজা জানালা বন্ধ ঘরটার মধ্যে ও খাঁচায় পোরা বাঘের মতো পায়চারি করেছিল। তারপরে হঠাৎ মনে পড়তেই, দলা মোচড়া দরখাস্তটা ঘরের কোণ্ থেকে কুড়িয়ে নিয়েছিল।

খুলে পড়েছিল। দাবী পত্র না, আবেদন, সকলেরই পঁচিশ ভাগ করে মাইনে বাড়ানো হোক। পঁচিশ ভাগ। মামদোবাজী? ও আবার কাগজটা দলা পাকিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল। সুমতির কাছে গিয়েছিল। সুমতি তখন গ্যাসের উনোনে সকালের জল-খাবার তৈরি করছিল। দেবনাথ বলেছিল, 'তুমি কিছু শুনেছো, ঐ হারামজাদাদের কথা?'

'কোন্ হারামজাদা?' সুমতি অবাক চোখে তাকিয়েছিল।

দেবনাথ কারখানার দিকে হাত তুলে দেখিয়ে বলেছিল, 'ঐ মিস্তিরি মজুরদের কথা?'

'এরা আবার হারামজাদা হলো কবে থেকে? সুমতি গ্যাস উনোনের কড়ার দিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। হাসি রাগ বিস্ময়, কিছুই ছিল না ওর মুখে। এমন কি জিজ্ঞাসাও। তবু জিজ্ঞেস করেছিল, 'কী করেছে ওরা?'

দেবনাথ বলেছিল, 'ওরা পঁচিশ পারসেণ্ট মাইনে বেশি দাবি করছে। আর ভয় দেখিয়েছে, কারখানা অচল করে দেবে, কোনো ফুরনের মজুরি মিস্তিরিদের ঢুকতে দেবে না। এত সাহস ওদের?'

'তা তুমি কী বললে?' সুমতি মুখ না ফিরিয়েই জিজ্ঞেস করেছিল।

দেবনাথ কঠিন স্বরে বলেছিল, 'কী আবার? বলে দিয়েছি, এক পয়সাও মাইনে বাড়াবো না।'

'হাত ধুয়ে খেতে বস।' সুমতি বলেছিল, 'জল-খাবার হয়ে গেছে।'

রান্না ঘরের পাশেই খাবার ঘর। দেবনাথ খাবার ঘরের বেসিনে হাত ধুতে ধুতে বলেছিল, 'আমি ঠিক বলিনি?'

সুমতি খাবার টেবিলে গরম পরোটা আর আলুর ছেঁচকি বেড়ে দিয়েছিল। হেসে বলেছিল, 'আমি কি এসবের ঠিক বেঠিক কিছু বুঝি নাকি? তুমি যা ঠিক ভেবেছো, বলেছো।'

দেবনাথও হেসেছিল। ধরেই নিয়েছিল, সুমতি ওর কথাই ঠিক বলে মেনে নিয়েছিল। খাবার খেতে খেতে বলেছিল, 'আমার জেল খাটা

নিয়ে, ঐ বুড়ো হারুটা কী বলছিল, জানো? বলছিল, ও কথা বলে না কি আমি বারফট্টাই করি। কতো বড় সাহস! আমাকে মজুর আন্দোলন দেখাতে এসেছে?'

'মিনু খেতে আয়।' সুমতি মিনতিকে ডেকেছিল। ঐ প্রসঙ্গে আর কোনো কথা বলেনি।

দেবনাথ আবার সেই খিল্‌খিল্‌ হাসি শুনতে পেলো। ওর চোয়াল শক্ত হলো। পুবের দরজা দুটো বন্ধ করে, অফিস ঘরে গেল। একটা বড় টেবিল। গোটা কয়েক চেয়ার। ওর নিজের চেয়ারটা গদী আঁটা। টেবিলের ওপর কিছু কাগজ ফাইল। রবার কোম্পানির ছাইদানি। একটা প্লাস্টিকের বাটিতে কিছু নাট বল্টু, একটা ব্লেড। পূর্ব দিকের বন্ধ দরজার মাথার ওপরে মাটির গণেশের মূর্তি। পশ্চিম দিকে, বড় রাস্তায় যাবার দরজাটাও বন্ধ। দক্ষিণের দরজা খোলা। দরজার কাছ থেকে চার ফুট ইঁট বাঁধানো রাস্তা, বসত বাড়ির পিছনের বারান্দা পর্যন্ত গিয়েছে। প্রায় দু' কাঠা খোলা জমির ওপরে আসল বাগান। সুমতির হাতে তৈরি বাগান। চার ফুট ইঁটের রাস্তার দু' পাশে, কলা গাছ থেকে নারকেল গাছের চারা। লেবু জবা শিউলি। বেল টগর জুঁই অপরাজিতা। পশ্চিমের বড় রাস্তার দিকে উঁচু পাঁচিল। পুব দিকেও পাঁচিল আছে, বসত বাড়ির আবরু রক্ষার জন্য।

দেবনাথ দক্ষিণের দরজা দিয়ে বাইরে গেল। একতলা বাড়ির তিন দিকেই ছাদ ঢাকা বারান্দা। গ্রিল দিয়ে বারান্দা ঘেরা। বসত বাড়িতে ঢোকবার রাস্তা দক্ষিণ দিকে। এ বাড়ির সীমানা পেরিয়ে, দক্ষিণ দিকে অন্য একজনের পাঁচিল ঘেরা বড় বাগান।

দেবনাথ বাড়ির দিকে তাকালো। বাড়ির পিছন দিকে বাথরুম, রান্না ঘর। সোকপিট ট্যাঙ্কও পিছন দিকে। সুমতি বোধ হয় রান্না ঘরে। দেবনাথ বাগানের পুব দিকে গেল। দক্ষিণ দিকে দেখলো। যা ভেবেছিল, ঠিক তাই। বাড়ির দক্ষিণে, পুব দিকে পাঁচিলের ধারে

বড় একটা আমগাছ। আমগাছ সহই জমিটা কেনা হয়েছিল। আম গাছের নিচে বসেছিল হারু আর ফটিক। তাদের সামনে দাঁড়িয়ে মিনতি। মাথার চুল খোলা, বাতাসে উড়ছে। শাড়ির আঁচল গাছ কোমরে জড়ানো। ওরকম জড়ানোর অর্থ একটাই। সরু কটি, চওড়া নিতম্ব, মেদহীন পেটের ওপরে বুক জোড়া আরও স্পষ্ট আর উদ্ধত করে তোলা। দেবনাথের এটাই বিশ্বাস। আর ঐ ফটিক, কারখানার পালের গোদা। খুব সাধারণ মোটা কাপড়ের কালো ট্রাউজার। আর বুক খোলা, বগল ছেঁড়া একটা নীল রঙের হাওয়াই শার্ট গায়ে। লম্বা প্রায় ছ' ফুটের মতো। রোগা কিন্তু শক্ত চেহারা। এক মাথা রুক্ষ চুল। কালো চোখ দুটো ঝকঝকে। বয়স ছাব্বিশ সাতাশ হলেও, আর এক জোড়া মোটা গোঁফ থাকা সত্ত্বেও, মুখে এখনও একটা কোমল ভাব আছে। মেয়েদের মতো টিকলো নাক। চিবুকে একটা সরু খাঁজ।

'শুয়োরের বাচ্চা!' দেবনাথ চোয়াল শক্ত করে মনে মনে বললো। এই ফটিক পাঁচ বছর আগে, ওর রিকশা চালাতো। হ্যাঁ, দেবনাথের চারটি রিকশা ভাড়া খাটে। আজকাল প্রত্যেক রিকশার জন্য, মালিকের রোজ পাওনা চার টাকা। পাঁচ বছর আগে ছিল আড়াই টাকা। ফটিক চাকি—ভদ্রলোকের বাড়ির গরীব ছেলে। থার্ড ডিভিশনে স্কুল ফাইনাল পাস করেছিল। পাঁচ বছর আগে, দেবনাথের রিকশা চালাতে এসেছিল। রোজের টাকা পাবার জন্য ছেলেটার পিছনে পিছনে ঘুরতে হতো না। অন্য রিকশাওয়ালাদের পিছনে যেমন ঘুরতে হয়। অধিকাংশই জুয়াড়ি আর মদখোর হয় রিকশাটানারা। ফটিকের সে-সব দোষ ছিল না। আজকাল অবিশ্যি মাঝে মধ্যে খায়, তবে লুকিয়ে। কেবল বিশ্বকর্মা পুজোর দিন, দেবনাথ নিজেই খাওয়ায়। তখন ফটিকের চেহারা ছিল আরও রোগা। চোখের কোলে কালি। গোটা চেহারায় আর মুখে অনাহারের ছাপ। ছেলেটার ওপর দেবনাথের মায়া পড়ে গিয়েছিল। মাস দুয়েক রিকশা চালাবার পর, ও নিজেই ফটিককে বলেছিল, 'রিকশা না টেনে, রিকশা বানাবার কাজ শেখ। মজুরিও বেশি

পাবে, রিকশা টানার ধকলও সইতে হবে না। আফটার অল্, তুমি তো ভদ্রলোকের ছেলে, লেখাপড়াও শিখেছো।'...সেই থেকে ফটিক রিকশা তৈরিতে লেগেছিল। হাত পাকিয়েছিল বডি মিস্তিরি হিসাবে। এখন ওর মতো ভালো বডি মিস্তিরি এ তল্লাটে নেই। ফটিককে কারখানায় কাজে লাগানোয়, সুমতিও খুশি হয়েছিল। ফটিককে সে স্নেহ করে। রমেশ মিস্তির ফটিককে অনেক টোপ দিয়েছে, নিজের কারখানায় নিয়ে যাবার জন্য। ফটিক যায়নি। ফটিক কেবল বডি মিস্তিরি না। বারো ঘণ্টার মধ্যে একটা পুরো রিকশা তৈরি করতে পারে একাই। ফ্যান্সি রিকশার বডিতে, পিতলের নকশা আঁকতে, কাটতে, জুড়তেও ওর জুড়ি নেই। হারুও ভালো বডি মিস্তিরি। ডাইস থেকে ড্রিল মেসিনের সব কাজ করতে জানে।

ফটিক কিছু বলছিল। হারু বিড়ি টানতে টানতে হাসছিল। মিনতি ফটিকের কথা শুনেই, খিলখিল করে হেসে উঠছিল। ছেনালি। তাছাড়া আর কী? মিস্তিরি মজুরদের সঙ্গে ওভাবে হেসে কথা বলার মানে কী? বিশেষ করে, যারা ওর ভগ্নিপতির সঙ্গে শত্রুতা করছে, তাদের সঙ্গে এখনও ঐভাবে হাসি গল্প? দেবনাথের মোটেই পছন্দ না, ফটিকরা বসতবাড়ির সীমানার মধ্যে আসে। বরাবরই আসে, উঠোনে বসে। প্রয়োজনে, ঘরের ভিতরেও যায়। বিশেষ করে ফটিক। অনেকটা বাড়ির ছেলের মতোই। তা বলে এখনও আসবে? মাইনে বাড়াবার জন্য যাঁরা দেবনাথের বিরুদ্ধে লড়ছে, কাজ বন্ধ করে। সর্বনাশ করছে, খরিদ্দারদের কাছে ওকে অপদস্থ করছে, তাঁরা বাড়ির উঠোনে বসে গল্প করবে? ওর শালীর সঙ্গে মজাকি করবে? আর শালীও ঐরকম ঢলানিপনা চালাবে? সুমতির কি কিছু মনে হয় না? বোনকে কিছু বলতে পারে না। ঐ শুয়োরগুলোকে বাড়ির সীমানা থেকে তাড়িয়ে দিতে পারে না?

দেবনাথ দাঁতে দাঁত পেষে, আর মনে মনে অবাক হয়। সুমতি ওদের কিছু বলে না। বরং যে-রকম হেসে কথা বলে, সে-রকমই বলে।

যেন কারখানায় ধর্মঘটের ব্যাপারটা সুমতির কাছে কোনো ঘটনাই না।
এ বিষয়ে একটা কথাও দেবনাথের সঙ্গে বলে না। দেবনাথ বললে,
চুপচাপ কেবল শুনে যায়। ও কি বুঝতে পারছে না, দেবনাথের সর্বনাশ
হয়ে যাচ্ছে? সাতদিন হয়ে গেল, একটাও মাল তৈরি হয়নি। নতুন
অর্ডার নিতে পারছে না। যে-সব খরিদ্দার অর্ডার দিয়েছে, তাঁরা ক'দিন
চুপ করে থাকবে? দেবনাথ অ্যাডভান্স নেয় না বটে। খরিদ্দাররা
মুখের উপর কিছু বলতে পারে না। কিন্তু সরে পড়লে, তাঁদের আর
আটকানো যাবে না। আর এই সর্বনেশে হারামজাদাগুলো বাড়ির
উঠোনে বসে হাসি মশকরা করছে। সুমতি তেলেভাজা মুড়ি চা করে
খাওয়ায় নি তো? যে-রকম মাঝে মধ্যে খাইয়ে থাকে? স্বামীর শত্রুদের
এতোটা খাতির নিশ্চয়ই করবে না।

দেবনাথকে দেখামাত্রই, মিনতি হাসি থামিয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেল।
ফটিক আর হারুও কথা হাসি থামিয়ে চুপ করে গেল। মিনতি পিছন
ফিরে প্রায় ছুটেই চলে গেল বাড়ির মধ্যে। দেবনাথ শক্ত মুখে,
শুঁয়োপোকা ভুরু কুঁচকে এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইলো। তারপর এগিয়ে
গেল পাঁচিলের ধারে আমগাছের দিকে। বাতাসে গাছের ডালপালায়
ঝরঝর শব্দ। ধুলো উড়ছে। কোকিলটা কোথায় কোন্ গাছ থেকে
ডেকেই চলেছে। দেবনাথ গাছতলার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। ঘৃণা
মেশানো রাগী চোখে তাকালো ফটিক আর হারুর দিকে। হারু বিড়িটা
ফেলে দিল। ফটিক দেবনাথের দিকে তাকালো। দেবনাথ ডান
হাতের তর্জনী তুলে দু'জনকে দেখিয়ে বললো, 'ইউ টু—মাই এনিমি।'

'বাঙলায় বলুন না।' ফটিক নির্বিকার মুখে বললো।

দেবনাথের মুখ রাগে আরও চওড়া হয়ে উঠলো, 'জানি, মূর্খেরা
ইংরেজি বোঝে না। আমি চাইনে, আমার শত্রুরা আমার বাড়ির
উঠোনে এসে বসবে। গেট আউট, বেরিয়ে যাও এখান থেকে। আমার
বাড়ি আর কারখানার ত্রিসীমানায় আমি তোদের মুখ দেখতে চাইনে।'

খুব তো তড়পাচ্ছেন, আর তাড়িয়ে দিচ্ছেন। ফটিক ঝেঁজে বললো,

'তাড়িয়ে দিচ্ছেন, চলে যাচ্ছি। আমাদের বকেয়া মাইনেটা মিটিয়ে দিন।'

দেবনাথের চোখে একটু আশার আলো ফুটলো। কিন্তু সেটা ওদের জানতে দিতে চাইলো না। বললো, 'তা মিটিয়ে দিচ্ছি, আজ এখনই দিচ্ছি। কারখানার সঙ্গে তোরা আর সম্পর্ক রাখবি না তো? একেবারে ছেড়ে চলে যাবি তো?'

'তাই কখনো যাই না কি? ফটিক হাসলো, 'আপনি ভাবছেন, আমরা একেবারে ছেড়ে চলে যাব, আর আপনি অন্য লোক এনে ফুরনে কাজ করাবেন? তা আমরা হতে দেব না।'

দেবনাথ পা তুলে মাটিতে লাথি মারলো, 'কারখানা কি তোদের বাপের সম্পত্তি না কি?'

'বাপ তুলে গাল দিচ্ছেন?' ফটিক হাসলো, কিন্তু ওর চোখের দৃষ্টি কঠিন, 'না, কারখানা আমাদের বাপের নয়, আপনারই। কিন্তু কাজ তো করি আমরাই। মাল বানাই আমরা। কাল তো শাসিয়েছিলেন, পুলিস ডেকে ফুরনে কাজ করাবেন। তা পুলিস ডাকলেন না কেন? ফুরনে কাজ করালেন না কেন?'

দেবনাথ হুম্‌কে উঠলো, 'সে কৈফিয়ৎ তোদের দিতে হবে না কি?'

'দরকার নেই।' ফটিক বললো, 'শাসিয়েছিলেন, তাই বললাম। তবে কোনো মিস্তিরি মজুরই আপনার কারখানায় কাজ করতে আসবে না। মনে রাখবেন, তাঁরা আমাদের বন্ধু, আপনার নয়। যাক গে, বকেয়া মাইনেটা কি আজই মিটিয়ে দেবেন?'

দেবনাথ সজোরে ঘাড় নাড়লো, 'না, দেবো না। কাজ বন্ধ রেখে, বকেয়া মাইনে চাইছিস্? ইউ অল্ বেইমানের দল! একটা পয়সাও দেবো না। নাউ গেট আউট।'

'চল হারুদা।' ফটিক উত্তরের দিকে পা বাড়ালো। দেবনাথের দিকে তাকালো 'আমাদের না খাইয়ে মারছেন। এখনো বলছি, কাজটা ভাল করছেন না। আমরা অন্যায্য কিছু চাইনি। কারখানা লাটে উঠে যাবে, বলে রাখছি।'

দেবনাথ মুঠি পাকিয়ে ফটিকের দিকে তু'পা এগিয়ে গেল, 'বেরো এখান থেকে। কারখানা লাটে তুলবি? তোর বাপের কারখানা পেয়েছিস, লাটে তুলবি? মগের মুলুক? বেশি কথা বললে মুখ ভেঙে দেবো।'

'না, ওটা পারবে না বাবু।' হারু মিস্তিরি ফোকলা দাঁতে হেসে বললো, 'সত্যি তো এটা মগের মুলুক নয়? তুমিই বললে। এত সহজে মুখ ভাঙা যায় নাকি? সত্যি একটু মাথা ঠাণ্ডা করে ঘরে বসে ভাব। মিছিমিছি গালাগাল দিও না।'

ফটিক আর হারু, তুজনেই উত্তর দিকে চলে গেল। দেবনাথ ক্রুদ্ধ চোখে তাকিয়ে রইলো। বাতাসে যেন কেমন একটা ঝোড়ো বেগ। দক্ষিণের পাঁচিল ঘেরা বাগান থেকে শুকনো পাতা উড়ে আসছে। তার সঙ্গে ধুলো। দেবনাথ ঘুরে, বারান্দার দিকে গেল। কাজের মেয়েটি বেরিয়ে এলো এক গোছা সাবান কাচা জামা কাপড় নিয়ে। দেবনাথকে দেখে যেন ভয়ে কুঁকড়ে গেল। কোনো রকমে পাশ কাটিয়ে উঠোনে নেমে গেল। দেবনাথ সামনের ঘরে ঢুকলো। বসবার ঘর। বাঁ দিকে, তুটো শোবার ঘর। বসবার ঘরের পাশে খাবার ঘর। ও সেদিকে গেল। সুমতি রান্না ঘরের ভিতরে রান্না করছে। মিনতিকে দেখা যাচ্ছে না। দেবনাথ রান্না ঘরের দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। সুমতি পিছন ফিরে বসে রান্না করছে।

'আমি ওদের আজ বলে দিয়েছি, ওরা যেন আর আমার বাড়ির ত্রিসীমানায় না আসে।' দেবনাথ সুমতির ঘাড়ের দিকে তাকিয়ে বললো।

সুমতি মুখ না ফিরিয়ে, গ্যাস উনোন থেকে কড়া নামালো। চাবি ঘুরিয়ে, উনোন নিবিয়ে দিল, 'ও। সে তুমি যা ভালো বুঝেছো, করেছো। মিনুর একটা ব্যাপার হয়েছে।'

'কী ব্যাপার?' দেবনাথের ভ্রূকুটি চোখে অনুসন্ধিৎসু কৌতূহল।

সুমতি দেবনাথের দিকে তাকালো। তার পান খাওয়া ঠোঁটে মৃত্বু

হাসি, 'ও নাকি ফটিককে ভালবাসে। ফটিকও। ওরা বিয়ে করবে।'

'হোয়াট ?' দেবনাথ ঘর কাঁপিয়ে গর্জে উঠলো, 'ঐ লোচ্চা আমার কারখানার ধর্মঘটী মিস্তিরি, যে একসময় রিকশা চালাতো, তোমার বোন তাকে বিয়ে করবে ?'

সুমতি সামনের ঘটি কাত করে, হাতে ঢাললো। আঁচলে হাত মুছতে মুছতে উঠে দাঁড়ালো, 'তা ওদের যদি ইচ্ছে হয়, তুমি আমি কী করতে পারি ?' সুমতি শান্ত স্বরে বললো, 'ওরা নিজেদের মতো নিজেরা বিয়ে করবে। আমরা কিছু দিতে যাচ্ছি নে।'

'তা বলে, ওরকম একটা লোচ্চা লাফাঙাকে ?' দেবনাথের গলার স্বরে উগ্র ক্রোধ আর বিস্ময়।

সুমতির ঠোঁটের হাসি মিলিয়ে গেল, 'লোচ্চা লাফাঙা কিনা জানি নে, তবে গরীব। তা মিনু যদি ওরকম গরীব ছেলেকে বিয়ে করতে চায়, আমাদের বলার কী আছে ? আমার কোনো আপত্তি নেই।'

'কিন্তু ও আমাদের শত্রু।'

'সেটা তো তোমার কারখানার ব্যাপার।' সুমতি আবার একটু হাসলো, 'বিয়ের সঙ্গে তার কী সম্পর্ক ? মিনু তো বিয়ে করে এ বাড়িতে থাকবে না।'

দেবনাথ সুমতির মুখের দিকে অবাক চোখে তাকালো। কোথায় যেন সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। ফটিকের সঙ্গে মিনতির বিয়ে, আর সুমতির কোনো আপত্তি নেই ! ভাবা যায় ? অথচ সুমতি অনায়াসেই রাজি। দেবনাথ পিছন ফিরতে উদ্যত হলো। সুমতি বললো, 'আর একটা কথা। আমি তো কোথাও কোনোদিন বাইরে যাইনি। ভাবছি, কিছুদিনের জন্য একটু পুরী বেড়াতে যাবো। তোমার তো এখন কোনো অসুবিধে নেই। কারখানা বন্ধ।'

দেবনাথ অধিকতর অবাক চোখে সুমতির দিকে ফিরে তাকালো, 'এখন পুরী বেড়াতে যাবে ? এই দুঃসময়ে ? কারখানা বন্ধ মানে কী ?'

ওরাই তো কারখানা বন্ধ করে রেখেছে, কাজ করছে না। এ সময়ে আমি যাবো কেমন করে?'

'তা হলে তুমি থাকো।' সুমতি বললো, 'মিনুর বিয়ের এখনো দেরি আছে। ওরা রেজিস্ট্রি করে বিয়ে করবে। আমি আর মিনুই বেড়িয়ে আসি। তুমি ট্রেনের টিকিট কেটে দিতে পারবে তো?'

দেবনাথের মনে হচ্ছিল, ওর মাথাটা ভারি হয়ে আসছে। ভিতরটা শূন্য। সুমতির শান্ত মুখের দিকে তাকিয়ে, অবাক স্বরে জিজ্ঞেস করলো, 'তোমরা দু'জন মেয়ে ছেলে পুরী যাবে? কোনো দিন যাও নি। কোথায় উঠবে, থাকবে—।'

'সে আমরা ঠিক ব্যবস্থা করে নেবো।' সুমতি খুব সহজেই বললো, 'মেয়ে ছেলে তো কী? মেয়েরা আজকাল কতো কী করছে। ট্রেনে উঠলে, সোজা পুরী গিয়ে নামবো। একটা হোটেল দেখে উঠবো। তুমি যদি টিকিট কেটে না দিতে পারো, আমি দাদার ছেলেকে বলে ব্যবস্থা করতে পারি।'

দেবনাথ নির্বাক অপলক অবাক চোখে সুমতির মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। মনে হলো, ওর ভারি মাথাটার মধ্যে, যেন ঢাক বাজছে। এ কি সব অভাবিত কথা। মিনতি বিয়ে করবে ফটিককে। সুমতি এ সময়ে পুরী বেড়াতে যেতে চাইছে। সুমতিও ওর চোখের দিকে তাকিয়েছিল। দেবনাথ কী বলবে, ভেবে পাচ্ছে না। সুমতি আবার বললো, 'বেলা কম হয় নি। চান করতে যাও। আমার রান্না শেষ।

কিন্তু সুমি, তুমি—তুমি—মানে টিকিট কেটে দিতে পারি আমি, কিন্তু—দেবনাথের চোখে অস্থির অসহায়তা ফুটে উঠলো, 'আমি একটু ভাবি, কেমন?'

সুমতি লক্ষ্মী মেয়ের মতো ঘাড় কাত করলো, 'ভাবো। আজকের দিনটা ভাবো।'

দেবনাথ খাবার ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। বাইরে এসে চারদিকে তাকালো। কেউ কোথাও নেই। বাতাসের বেগে ধুলো উড়ছে। পাতা

ঝরছে। কোকিলটা ডেকেই চলেছে। দেবনাথ সোজা ওর অ
ঘরে গেল। পকেট থেকে চাবি বের করে, বড় দেরাজ খুলে রাম্
বোতল বের করলো। মুখ খুলে নির্জলা বেশ খানিকটা গলায় ঢেলে দি
মুখ বিকৃত করে, বোতল রাখলো টেবিলের ওপর। সিগারেট ধর
একটা। গণেশের মূর্তির দিকে একবার দেখলো। আর মনে প
ওর কুষ্টির ছকটার কথা। মনে করতে পারছে না, জ্যোতিষী এ সম
কোনো ভবিষ্যৎ বাণী করেছিল কি না। ও আবার বোতল তুলে গ
ঢাললো। বিড়বিড় করে বললো, 'এ সবের মানে কী? আমাকে স
ছেড়ে যেতে চাইছে?' ও ঘন ঘন বোতল তুলে গলায় ঢালতে লাগ
আর খানিকক্ষণের মধ্যেই মাথাটা টেবিলের ওপর লুঠিয়ে পড়লো।

দেবনাথ জানে না, কতোক্ষণ টেবিলে মাথা পেতে পড়েছিল। ম
গায়ে স্পর্শ পেতেই, মুখ তুলে তাকালো। সুমতি। সুমতি বললে,
সময়ে এসব খেয়েছো কেন? চান করতে যাও।'

দেবনাথ সুমতির নির্বিকার শান্ত মুখের দিকে তাকালো। ওর দু
চোখ আর তামাটে মুখ লাল। কিন্তু ক্ষিপ্ততা নেই। প্রায় কোলা
ব্যাঙের মতো গলায় বললো, 'সুমি, পুরী যদি যেতেই হয়, আমিও
যাবো। তার আগে, আমি একটা হিসেব করে ফেলতে চাই।

'কিসের হিসেব?' সুমতির চোখে ভ্রূকুটি জিজ্ঞাসা।

দেবনাথ একইরকম স্বরে বললো, 'ওদের ঐ টুয়েন্টিফাইভ পারসেণ্ট
বাড়তি মাইনের হিসেব। কারখানা বন্ধ রেখে আমি, কোথাও যেতে
পারবো না। তোমাকেও ছাড়তে পারবো না।'

'ও হিসেব আমি করে রেখেছি।' সুমতি শাড়ির আঁচল দিয়ে
দেবনাথের ঠোঁটের কষের গাঁজলা মুছিয়ে দিল, 'মাসে তোমার বাড়তি
মাইনে দিতে, আট জনের হিসেবে লাগবে একশো সত্তর টাকার মতো।'

দেবনাথের লাল চোখে অবাক দৃষ্টি, 'তুমি হিসেব করে ফেলেছো?
আমাকে বলো নি তো?'

'তুমি তো জিজ্ঞেস করো নি।' সুমতি হাসলো।

ওরাঃ দেবনাথ সুমতির কোমরে হাত রাখলো, এবং হাসলো, 'এক শো
আত্তিরের মতো। সুমি আই উইল পে ছাট মানি—আমি তো আর
মিউনিস্ট নেই কিন্তু আমি একজন উদার স্থাশনাল বুর্জোয়া। লেনিন
আলেছেন, স্থাশনাল বুর্জোয়াদেরও বিপ্লবে একটা অংশ আছে, বুঝলে ?'
আ... 'না।' সুমতি দেবনাথের মাথার চুলে বিলি কেটে দিল, 'আমি
সব বুঝিনে। আমি বুঝি, নিজেদের ক্ষতি না করে, কাজ কারবার
শূন্য ।স্তিতে চলুক। ওরাও খুশি থাক, তোমারও যেন লোকসান না হয়।
'তোামি হিসেব করে দেখেছি, এক শো সত্তর টাকা মাসে বেশি খরচ
কোরলেও, তোমার লোকসান তেমন কিছু নেই। ফুরনে কাজ করালে,
তামাকে মাসে ষোলটা মাল তৈরি করতে, চারশো টাকা বেশি খরচ
বলরতে হতো।

দেবনাথ সুমতির কোমর জড়িয়ে, মুখের কাছে টেনে আনলো,
'গড়! তুমি এতোটাও হিসেব করেছো! ওকে, সুমি আমি দেবো।
দো আই অ্যাম নো মোর এ কমিউনিস্ট, বাট—ইয়ে, মানে দেশের
প্রগতিতে আমারও অংশ নিতে হবে। ওদের এখনই—।'

'না, এখন তুমি চান করতে যাবে।' সুমতির স্বরে স্নেহ মিশ্রিত
আদেশ, 'ওঠো, চলো।'

দেবনাথ সুমতিকে জড়িয়ে ধরে উঠে দাঁড়ালো। বললো, 'কিন্তু
সুমি, মিনু যদি ঐ ফটিককে বিয়ে করে, আমি ওকে ভায়রাভাই মনে
করতে পারব না।'

'আচ্ছা করো না।' সুমতি হাসলো।

দেবনাথ আবার বললো, 'তা হলে পুরী যাওয়ার দিনটা—।'

ওটা পরে ভাবা যাবে। সুমতি ঘাড়ের ওপর ঢলে পড়া দেবনাথকে
নিয়ে দরজার দিকে এগোলো।

ফাল্গুনের বাতাসে ঝোড়ো বেগ যেন আরও বাড়ছে। ধুলো উড়ছে,
পাতা ঝরছে। পাখিটা ডেকেই চলেছে।

পাতিহাস

চার

স্বামী স্ত্রী মুখোমুখি বসে আছে। ছোট ডাইনিং টেবিলের ওপরে, প্লেটে পড়ে আছে ভুক্তাবশিষ্ট মাখন টোস্টের শক্ত ধারওয়ালা টুকরোগুলো। চায়ের কাপ শূন্য।

সময় বিকাল সাড়ে পাঁচটা। প্রাইভেট কোম্পানির কোয়ার্টারের কম্পাউণ্ডে, খোলা জায়গায় দশ বারো বছরের একদল ছেলে ফুটবল খেলছে। বেশ বড় কম্পাউণ্ড। বল পেটানোর দুম্ দাম্ শব্দের সঙ্গে, ওদের চিৎকার চেঁচামেচি ভেসে আসছে। কম্পাউণ্ডের একদিকে ছোটদের জন্য আছে দোলনা। শ্লোপিংবার। এমন কি ব্যাডমিণ্টনের কোর্ট। এই গ্রীষ্মকালে যদিও কেউ ব্যাডমিণ্টন খেলছে না। সেখানে প্যারাম্বুলেটারে শিশু নিয়ে পাক দিচ্ছে দুই তিনজন আয়া। যদিও এদের আয়া ঠিক বলা যায় না। ঝি পর্যায়ে পড়ে। মাঝারি পোস্টের কর্মচারিরা বা তাদের স্ত্রীরা ঝিকে মেড-সারভেণ্ট বলে। সময় বিশেষে আয়া।

কম্পাউণ্ড ঘিরে দোতলা। ছোট ছোট দুই বেড-রুমের ফ্ল্যাট অনেকগুলো। ছশো থেকে হাজার টাকা বেতন পায়, এরকম কর্মচারীদের কোয়ার্টারস্। উল্টো দিকে তিন বেডরুমের বড় দোতলা কোয়ার্টারস্। দু তিন হাজারি বেতনধারী কর্মচারীদের কোম্পানীর দেওয়া আস্তানা। এরা অফিসার র‍্যাংকে পড়ে। নিজেদের সাহেব মনে করে। ঝি-চাকরদের প্রতিও নির্দেশ, সাহেব বলে ডাকতে হবে। সাহেব গিন্নীকে, অতএব, মেমসাহেব।

দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মচারীদের কম্পাউণ্ড কোয়ার্টারের দিকে, প্রথম শ্রেণীর কর্মচারীদের কোয়ার্টারের পিছন দিক। তাদের আরও বড় কম্পাউণ্ড এদিক থেকে দেখা যায় না। সেখানেও বড় কম্পাউণ্ডে

খেলার জায়গা আছে। অতিরিক্ত আছে একটি টেনিস লন, আর একদিকে সারি সারি মোটর গ্যারেজ। কৌলিন্যের দিক থেকে এই ব্লককে প্রথম শ্রেণীর বলতে হবে। কিন্তু সর্বোচ্চ না।

সর্বোচ্চরা কখনও ঐ রকম ব্লক বেসিসে ফ্ল্যাটে থাকে না। তাদের জন্য বাংলো। পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন, বাগান সংলগ্ন বাংলো। এর আবার এক রকম গরীবিয়ানা নামও আছে, যাকে বলে কটেজ। এরা কুটিরবাসী। কুঠি না। সেটা ছিল সেকালের আভিজাত্য। নীলকুঠি কিংবা চটকলের কুঠি। বর্তমানের আভিজাত্য কটেজ। এর সংখ্যা কম। সামনে বাগান। পিছনে টেনিস লন, ব্যাডমিণ্টন কোর্ট। ঝি চাকর আয়াদের জন্য আলাদা ঘর। মোটর গ্যারেজ অবশ্যিই আছে। এরা ম্যানেজারিয়াল র‍্যাংকে থেকে এক্জিকিউটিভ পদের লোক।

তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীদেরও আলাদা কোয়ার্টারস্ আছে। চারতলা বড় ফ্ল্যাট বাড়ি। একটি বেডরুম, একটি বসার ছোট ঘর। খাবার ঘর আলাদা নেই। রান্না ঘর আছে। আর কেমন করে যেন এই সব ছোট ছোট খোপগুলোতেই জনসংখ্যার চাপও বেশি। এদেরও কম্পাউণ্ড আছে। আয়তনে ছোট। বাচ্চাদের খেলবার জন্য সেখানেও দোলনা আছে, শ্লোপিংবার আছে।

বিহারের একটি শহরে, একটি বড় কারখানাকে ঘিরে, এই সব স্টাফ কোয়ার্টার, বড় রাস্তা, অফিস বিল্ডিং, মার্কেট প্লেস, সব মিলিয়ে একটি শহর। আর এই শহর, কোম্পানির স্টাফদের মধ্যে। আছে সর্ব ভারতীয় নানা ধর্মের লোক। যাকে বলে পুরোপুরি কসমোপলিটন।

দ্বিতীয় শ্রেণীর কোয়ার্টারসের এক তলার ডাইনিং টেবিলে স্বামী স্ত্রী মুখোমুখি বসে আছে। ভুক্তাবশিষ্ট টোস্টের টুকরো আর শূন্য চায়ের কাপ দেখলেই বোঝা যায়, স্বামী চাকরি থেকে ফিরে বিকালের টিফিন খেয়েছে। তার হাতে জ্বলন্ত সিগারেট। মুখ কেবল চিন্তামগ্ন না, রীতিমতো থমথমে। তাকিয়ে আছে বাইরের জানালার দিকে। জানালার ওপরে পর্দা, বাতাসে উড়ছে। কিন্তু সে যে বাইরের কিছুই

দেখছে না, তার অন্যমনস্ক চোখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে। পাজামার ওপরে গেঞ্জি গায়ে, অনধিক লম্বা দোহারা গড়নের স্বাস্থ্যবান পুরুষ। বয়স পঁয়তাল্লিশ ছেচল্লিশ হবে। মাথার চুল পাতলা, কপালে ও কানের কাছে কিছু রূপোলি রঙ ধরেছে। গায়ের রঙ ফরসা। নাক চোখা, একটু মোটা। বড় চোখ, চওড়া চোয়াল। গোঁফ দাড়ি কামানো।

স্ত্রীর বয়স অনধিক চল্লিশ। দেখায় আরও কম। ফরসা রঙ, টিকলো না বলে, ঈষৎ বোঁচাই বলা যায়। কিন্তু চোখ দুটি টানা ও কালো। মেদবর্জিত দীর্ঘ শরীরে স্বাস্থ্যের দীপ্তি ও লাবণ্য নষ্ট হয় নি। স্লিভলেস্ জামা, সিনথেটিক ছাপা শাড়ি গায়ে। চোখে বোধহয় কাজলের সামান্য রেখা টানা। ঠোঁট স্বাভাবিক রঙেই কিঞ্চিৎ লাল। কপালে লাল টিপ, সিঁথেয় সিঁদুর। চিন্তিত বিমর্ষ মুখ। তাকিয়ে আছে, মুখ নীচু করে স্বামীর মুখের দিকে।

স্বামী সিগারেটে একটা টান দিয়ে গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করল, 'কিছু বলেছো নাকি?'

'না।' স্ত্রী মুখ তুললো বলেছি মানে, জিজ্ঞেস করেছি। যেমন লুকিয়ে ওর পকেট ঘাঁটি, সেই ভাবেই ঘাঁটতে গিয়ে দেখি, একটি দশ টাকার নোট। জিজ্ঞেস করলাম, তোর পকেটে এ টাকা এলো কোথা থেকে? জবাব সেই একই, ও আমার টাকা নয়, এক বন্ধুর টাকা। আমার কাছে রেখেছে, আবার দিয়ে দেবো।'

বিকাশ সেন। অর্থাৎ স্বামী, স্ত্রী মালবিকার চোখের দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকালো সেই ভ্রূকুটি-তীক্ষ্ণ চোখের দৃষ্টি দেখলে মনে হয়, সে মালবিকাকেই অপরাধী ভাবছে। জিজ্ঞেস করলো, 'তারপর?'

'তারপর আর কি।' মালবিকা একটা নিশ্বাস ফেললো, 'তোমার কথা মতো আমি জেরা করেছি। বলেছি, এর মানে কী? কিছুদিন ধরেই দেখছি তোর পকেটে প্রায়ই দশ বিশ পঁচিশ টাকাও থাকছে। কখনো দামী চকোলেট। জিজ্ঞেস করলেই বলিস, অমুক বন্ধুর টাকা। তোর কাছে রেখে দিয়েছে। কেন? তোর বন্ধুরা কি বাড়ি থেকে

টাকা চুরি করে তোর কাছে গচ্ছিত রাখে? ও কেমন হেসে চলে, সেই রকমই জবাব, তুমি কি ভাবো আমার বন্ধুরা চোর? রণবীর চোপরা বড়লোকের ছেলে। বিনয় কেলকার, অজিত শ্রীবাস্তব, সুরজিৎ সিং এরা তো সবাই বড়লোক। কিন্তু আমি বুঝতে পারি, ওর হাসিটার মধ্যে স্বস্তি নেই। মিথ্যে কথা বানিয়ে বলছে। আমি জিজ্ঞেস করি আর এই সব ভালো ভালো চকোলেট? এ সবও কি তোর সেই বন্ধুরাই দেয়? জবাব দিতে গিয়ে ও কেমন বিব্রত হয়ে পড়ে। ঢোক গিলে হেসে জবাব দেয়, হ্যাঁ তা ছাড়া আর কে দেবে? বুড়ঢো, বিরিজলাল, সৌগত, ওরা কি দেবে? ওদের অবস্থা তো আমাদের মতোই।'

বিকাশের মুখ আরও চিন্তিত, গাম্ভীর্যে থমথমে হয়ে ওঠে, অথচ আশ্চর্য এই, ও যে সব বড়লোকের ঘরের বন্ধুদের কথা বলে, তারা কোনোদিন আমাদের বাড়ি আসে না। আমাদের সঙ্গে পরিচয়ও নেই। তারাই ওর কাছে টাকা রাখে। ওরাই ওকে দামী চকোলেট খাওয়ায়।

'সে কথাও আমি বলেছি। মালবিকা বললো, তোর যে সব বন্ধুরা তোর কাছে টাকা রাখে, তোকে চকোলেট খাওয়ায়, তাদের বাড়িতে ডেকে আনিস না কেন? আমাদের সঙ্গে তাদের পরিচয় করিয়ে দিতে পারিস না? আমি বেশ বুঝতে পারি ও মিথ্যে করে বলে, ওদের তো আমাদের বাড়িতে আসতে বলি। ওরা আসতে চায় না। না আসতে চাইলে আমি কী করবো?'

বিকাশ বেশ ঝাঁজের সঙ্গে বললো, বলবে, তা হলে তুমি ওদের সঙ্গে মিশতে পারবে না। আমি পছন্দ করছি না, তুমি ওদের সঙ্গে মেশো।'

'তুমি কি ভেবেছো, আমি সে কথা বলিনি? মালবিকার চোখে মুখে একটা বিরক্তি ফুটে ওঠে, আমি পরিষ্কার বলেছি, যে বন্ধুরা তোমার বাড়িতে আসতে চায় না, তোমার বাবা মার সঙ্গে পরিচিত হতে চায় না, এমন বন্ধুদের সঙ্গে তাহলে তোমার মেশা উচিত নয়।'

'হুঁ, তার জবাবে শ্রীমান কী বলে ?'

'শ্রীমানের জবাব সেই একই। 'মালবিকা বললো', বলে এক সঙ্গে এক স্কুলে, এক ক্লাশে পড়ি। মিশতে চাইলে আমি কী করবো ? আমি তো ইচ্ছে করে ওদের সঙ্গে মিশতে যাই না। মালবিকা এক মুহূর্তের জন্য থামলো, এবং আবার নিজের মন্তব্য করলো, কিন্তু এটা আমি পরিষ্কার বুঝতে পারি। ও সত্যি কথা বলছে না। ও মুখে হাসি বজায় রাখবার চেষ্টা করে কিন্তু সেই হাসিতে অস্বস্তি। আমার চোখে চোখ রেখে কথা বলতে পারে না। প্রত্যেকটা কথার জবাব দিতে গেলেই, একবার করে ঢোক গেলে।'

বিকাশ চুপচাপ চিন্তিত মুখে কয়েকবার সিগারেট টানলো। মালবিকার ভিতরের অস্বস্তি আর উত্তেজনা টের পাওয়া যাচ্ছে, তার বারেবারে হাতের মুঠি পাকানো আর খোলা দেখে। বিকাশ টেবিলের ওপর রাখা ছাইদানিতে সিগারেটের ছাই ঝেড়ে দিয়ে বললো, আচ্ছা মালা একটা বিষয়ে তুমি তো নিশ্চিত, ঝুনু তোমার সংসারের তবিল থেকে বা আমার পকেট থেকে টাকা সরাচ্ছে না ?

'তোমার এই কথাটার জবাব আমি অনেকবার দিয়েছি।' মালবিকার মুখ একটু গোমড়া হলো, তোমার দেওয়া সংসার খরচের তবিলে, আমার পাই পয়সার খরচ পর্যন্ত টোকা থাকে। সেখান থেকে দশ বিশ তো দূরের কথা, দুটো টাকা এদিক ওদিক হলে আমি টের পেতাম। আর তোমার পকেট হাতড়ানো ? সেটা তো তুমিই ভালো জানো। তোমার কি মনে হয়েছে, তোমার মানিব্যাগের টাকার কোনো গোলমাল দেখা দিয়েছে ?

বিকাশ চিন্তিত মুখে মাথা নাড়লো, 'না। আমার মানিব্যাগে কতো টাকা আর থাকে ? আমার হাত খরচের মধ্যে তো সিগারেট কেনা। অফিসে যাই সাইকেল চেপে। স্কুটার ট্যাক্সি কোনো খরচই আমার নেই। প্রভিডেন্ট ফাণ্ড কেটে যা মাইনে পাই, সবই আমাদের টায়টিকে গোনা গাথা টাকা। তুমি ঠিকই বলেছ, ঘর থেকে ও টাকা সরাচ্ছে না। তাহলে— ?'

বিকাশ উৎকণ্ঠিত চোখে মালবিকার দিকে তাকালো। উৎকণ্ঠা মালবিকার চোখেও। তদুপরি ওর চোখে জল এসে পড়লো। কান্না রুদ্ধ স্বরে বললো, 'আমি ভাবতেই পারিনে, ঝুনু আমাদের ছেলে, পরের বাড়ি থেকে টাকা চুরি করছে। আমার একমাত্র ছেলে, লেখাপড়ায় ভালো, প্রত্যেক বছর ভালো ভাবে পাশ করে, একজন প্রাইভেট টিউটর পর্যন্ত ওর জন্যে রাখতে হয়নি। তুমি যেটুকু দেখিয়ে দাও, তাতেই ওর যথেষ্ট। টিচার আর আন্টিদের সঙ্গে কথা বলে দেখেছি, সবাই ঝুনুর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। কোম্পানীর যতো কোয়ার্টারস্ আছে, যাদের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে, আজ পর্যন্ত ওর সম্পর্কে কেউ একটি বাজে কথা বলেনি। বরং সবাই ওর আচরণে খুশি। বুড়োর মা তো পরিষ্কার বলে, 'মালা, তোমার ঝুনুর মতো যদি আমার বুড়ো হতো, বেঁচে যেতাম। আমার ছেলে না করছে পড়াশোনা, বাজে ছেলেদের সঙ্গে মিশে মিশে গোল্লায় যাচ্ছে। আর ওর বাবা বাড়ি এসে আমাকে তড়পায়, তোমার জন্যই ছেলেটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।' মালবিকা থামলো, শাড়ির আঁচলে চোখ মুছে আবার বললো, ঝুনু চুরি করছে, এটা আমি বিশ্বাস করতে পারছি না।'

বিকাশ সিগারেটে শেষ টান দিয়ে, ছাইদানিতে গুঁজে দিল। বললো, 'আমারও ঝুনুকে চোর ভাবতে বাধে। আর এ সব বিষয়ে, আমার যা অভিজ্ঞতা, কোন ছেলে চুরি করতে শিখলে, আগে বাড়ি থেকেই হাত পাকায়। তারপরে সে অন্যদিকে হাত বাড়ায়। কিন্তু ঝুনু কোনদিনই বাড়ি থেকে একটা পয়সা না বলে নেয়নি। ওর সব থেকে বড় প্রমাণ আমার মানিব্যাগ তো আমি যেখানে সেখানে রাখি। ও ইচ্ছে করলেই সেখান থেকে না বলে পয়সা সরাতে পারে। তুমিও এমন কিছু সাবধানী নও, তোমারও সংসারের টাকা পয়সা অনেক সময় এদিকে ওদিকে পড়ে থাকে, কোনদিনই—।'

'তুমি গোড়ায় ভুল করেছ। মালবিকা বাধা দিয়ে বললো, ঝুনুর পকেটে দু চার পয়সা বা দু চার টাকা পাওয়া যায় না। দশ বিশ

পঁচিশ—আমাদের কতোটুকু সঙ্গতি? বাড়ির প্রশ্ন আসেই না। আর ঐ রকম দামী চকোলেট। মুন্নাটা কতোদিন আমার কাছে চকোলেট খেতে চেয়েছে। ঐ রকম ভালো চকোলেট আমি আমার দুই ছেলে মেয়েকে কোনদিন কিনে খাওয়াতে পারিনি। বিশেষ অকেশনে, জন্মদিনে বা কোন পাল পার্বনে বছরে দু চার দিন হয় তো দিতে পারি। তাও ঐ রকম দামী নয়।'

বিকাশ বললো, 'আর ঝুনু তো সেই সব চকোলেট তার বোন মুন্নাকেই দেয়।'

'তাই তো দেয়।' মালবিকা বললো, 'বোনকে তো অসম্ভব ভালবাসে। আবার বলে, আমার চকোলেট ভালো লাগে না। ওরা জোর করে দেয়। আমি ভাবি, ঠিক আছে, মুন্নাকে খাওয়াবো।'

বিকাশ আবার একটা সিগারেট ধরালো। এবং জিজ্ঞেস করলো, 'ঝুনু সিগারেট খাওয়া ধরেনি তো?'

'আমার মনে হয় না। মালবিকার স্বরে দৃঢ়তা, 'তাহলে আমি গন্ধ পেতামই। আজকাল আমি রেগুলার ওর পকেট সার্চ করি। দেশলাই বা সিগারেটের তামাকের সামান্য গুড়োও কোনদিন পাই নি। ছেলেরা সিগারেট খেলেই ধরা পড়ে, বোঝা যায়। তাছাড়া, সিগারেট খেতে হলে, বেশি টাকার দরকার কী? ধরেই যদি নিই, ঝুনু রোজ দু চারটে সিগারেট লুকিয়ে খাচ্ছে, তার জন্য কত খরচ লাগে? না বাপু, আমি বিশ্বাস করিনে, ঝুনু সিগারেট খায়।'

বিকাশ চিন্তিত মুখে খানিকক্ষণ চুপচাপ আবার সিগারেট টানলো। বললো, 'আর একটা ব্যাপার আমার খুব সিগনিফিক্যান্ট মনে হয়েছে, তুমিও নিশ্চয় লক্ষ্য করেছো, টাকাগুলো যে ও কোথাও লুকিয়ে রাখবে, তাও নয়। ওর সে খেয়ালই থাকে না, ওর পকেটে টাকা আছে! তা নইলে ওর প্যান্টের পকেটে তুমি টাকা পেতে কেমন করে?

'ঠিক তো।' মালবিকা বললো, 'সে বিষয়ে ও মোটেই সজাগ নয়। যে ছেলে বাইরে কোথাও থেকে টাকা চুরি করবে, সেই টাকা সে

সাবধানে লুকিয়ে রাখবে। কিন্তু ঝুনু তো অনায়াসেই আমার কাছে ধরা পড়েছে। ধরো এক মাসের ওপর হয়ে গেছে, আমি প্রথম ওর প্যাণ্ট কাচতে দিতে গিয়ে দেখি, পকেটে একটা কুড়ি টাকার নোট। আমি তো হতবাক। ঝুনুর পকেটে কুড়ি টাকার নোট এলো কোথা থেকে? ওকে কিছু না বলে আগে আমি আমার সংসার খরচের টাকার হিসাব করলাম। দেখলাম সেখানে কোন গোলমাল নেই! প্রথম দিন যখন জিজ্ঞেস করলাম, ঝুনু টাকা কোথায় পেলি? সেই থেকে একই জবাব। অন্ততঃ কিছু না হোক দশ বারো বার ওর পকেট থেকে ওরকম টাকা পেয়েছি। অবিশ্যি প্রথম দিন থেকে সন্দেহ হবার পর, আমি ওর অজান্তে পকেট সার্চ করেছি। করতে গিয়েই বুঝলাম, নিশ্চয়ই কোথাও একটা গোলমাল করছে। ঝানু চোর ছেলে কখনও চুরির টাকার ব্যাপারে ওরকম ক্যালাস হয় না। তার সব সময়েই ধরা পড়ার ভয় থাকে। আমি তো দেখি, ও ভুলেই যায়, ওর পকেটে টাকা আছে, বা চকোলেট আছে। প্যাণ্ট খুলে আলনায় ছুঁড়ে ফেলে দেয়। যা ওর স্বভাব। স্কুল থেকে হোক, কোথাও গেলে-টেলে হোক, বাড়ি এসেই জামা প্যাণ্ট খুলে ছুঁড়ে দেবে। বাড়িতে পরার বা শোবার ঢাউস পাজামা গলিয়ে পড়তে বসে। কতোদিন কতো বকাঝকা করেছি, ঝুনু যথেষ্ট বড় হয়েছো, একটু ডিসিপ্লিন শেখ। নিজের জামা প্যাণ্ট জুতো একটু গুছিয়ে রাখো। তা কোনদিনই হয়নি। এ ব্যাপারে তোমরা বাবা ছেলে সমান।'

বিকাশ অতি দুঃখেও হাসলো, 'মিথ্যে বলোনি মালা। চিরকালই পরের ওপর নির্ভরশীল হয়ে রইলাম। তোমাকে বিয়ে করার আগে ছিলেন মা বউদিরা। তারপর থেকে তুমি। চাকরি করে টাকা রোজগার করা ছাড়া সংসারে আমি একেবারে অকর্মন্য। কিন্তু—।'

বিকাশ আবার চিন্তিত হয়ে পড়লো। এই সময়েই এক দল মেয়ে পাখিদের মতো কিচিরমিচির করে খাবার ঘরের টেবিলের কাছে এসে জড়ো হলো। সকলেরই বয়স দশ থেকে বারো। মুন্নার বন্ধু। বোঝা

গেল, খেলা নিয়ে ওদের মধ্যে একটা বিবাদ উপস্থিত হয়েছে। সবাই মালবিকাকেই বিশেষ করে ছেঁকে ধরলো। কেউ বলছে আন্টি, কেউ চাচীজী, কেউ কাকীমা। রুমাল চোর খেলা নিয়েই তাদের মধ্যে গোলমাল হয়েছে। যারা চোখ বেঁধে গোল হয়ে বসে থাকে, তারা কি কেউ সব সময়ের জন্য পেছনে হাত রাখতে পারে? তারা মাঝে মাঝে পিছনে হাত দিয়ে দেখবে, রুমাল রয়েছে কি না। সব সময় হাত দিয়ে রাখলে, সে তো টের পেয়ে যাবেই। তাহলে আর খেলার মজাটা কোথায়?

অভিযোগটা আসলে মুন্নাকে কেন্দ্র করেই। মুন্নার বয়স এখন বারো। ক্লাস সেভেনে পড়ে। ও বাবার মতো দেখতে হয়েছে। মেয়ে বলেই ওকে আরও ফরসা দেখায়। চেহারাটিও বেশ মিষ্টি। ও বললো, 'আমি মোটেই সব সময় পেছনে হাত রাখিনি। আমার যদি মনে হয়, আমার পেছনে রুমাল ফেলে গেছে, তাহলে দেখবো না? পিঠে কিল খেতে কি ভালো লাগে?'

'না মুন্না, পিঠে কিল খাবার ভয় থাকলেও, তুমি সব সময় পেছনে হাত রাখতে পারো না।' মালবিকা হেসে বলল, খেলার নিয়ম সবাইকেই মেনে চলতে হয়।'

মুন্না ঠোঁট ফুলিয়ে, ভুরু কুঁচকে বাবার দিকে তাকালো। বিকাশ হেসে বললো, 'মা তো ঠিকই বলেছে। খেলতে গিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে ঝগড়া করতে নেই।'

বাকি মেয়েরা সব হাততালি দিয়ে, কিচিরমিচির করে উঠলো। মুন্না রেগে গিয়ে বন্ধুদের বললো, 'আমি আর খেলবো না।'

'না এটা তোমার অন্যায় মুন্না।' মালবিকা গম্ভীর মুখে বললো, 'বন্ধুদের সঙ্গে ঝগড়া করতে নেই। যাও, সবাই মিলে মিশে খেলা করোগে।'

মুন্নাকে বন্ধুরা টেনে নিয়ে যেমন এসেছিল, আবার ছুটে বাইরে বেরিয়ে গেল। মালবিকা বললো, 'তোমার মেয়েটা পাজী আছে। অন্যায়ও করবে, আবার বন্ধুদের চোখও রাঙাবে।'

'ওটাও বোধহয় আমার স্বভাব।' বিকাশ মালবিকার দিকে তাকিয়ে হাসলো, 'যাক সব খারাপগুলোই ছেলেমেয়েরা আমার কাছ থেকে পেয়েছে। কিন্তু তোমার ছেলে?'

মালবিকা আবার গম্ভীর হলো, 'সেটা তো একটা একস্ট্রা অরডিনারি ব্যাপার। যার মাথা মুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি নে। ঝুনু আমার খাওয়া ঘুম কেড়ে নিয়েছে। এক মাসের ওপর ঘটনাটা প্রথম জানতে পেরেছি। তার আগে কতোদিন ধরে এরকম চলছে, তা কে জানে?

'তার থেকে খুব বেশি দিন আগের ব্যাপার বোধহয় না।' বিকাশ সিগারেটে টান দিয়ে বললো, 'তাহলে আরো আগেই ধরা পড়ে যেতো। ওতো পকেটের টাকার ব্যাপারে ক্যালাস। আচ্ছা ও আজকাল বিকেলে কোথায় খেলতে যায়?'

মালবিকা বললো, 'বড় গ্রাউণ্ডে যায়। অন্তত আমাকে তো তাই বলে যায়।'

'হুঁ।' বিকাশ আবার চিন্তিত হলো, 'আরো একটা ব্যাপার ভেবে দেখার আছে। চুরিই যদি করবে, টাকাগুলো দিয়ে ও কী করে? ছেলেরা তো অভাবেই চুরি করে। ওর কি সিনেমা দেখার নেশা হয়েছে?'

মালবিকা মাথা নেড়ে বললো, 'সে সময় কোথায়? তাহলে ওকে স্কুল পালাতে হয়। নুন শো ছাড়া, স্কুল পালিয়ে সিনেমা দেখার সময় নেই। কিন্তু ওর স্কুলের এ্যাটেনডেন্স রিপোর্ট সব সময়েই ভালো। ম্যাটিনী শো দেখতে গেলেও ক্লাস ফাঁকি দিয়ে পালাতে হয়। তাহলে বাড়ি ফিরতে দেরি হতো। কিন্তু তাতো কোনদিন হয় না। স্কুল থেকে ঠিক সময় মতো বাড়ি ফেরে। খায়, খেয়ে খেলতে যায়। ছটা থেকে সাড়ে ছটার মধ্যে বাড়ি চলে আসে। মাঝে মধ্যে দু একদিন দেরি করে। হয় তো সাতটাও বেজে যায়। জিজ্ঞেস করলে বলে, অমুক বন্ধুর বাড়ি টেনে নিয়ে গেছলো, নতুন গানের রেকর্ড শোনাবে বলে। ঝুনুর তো আবার একটু গান বাজনার শখ আছে। আজ পর্যন্ত ওকে

একটা রেকর্ডপ্লেয়ার কিনে দিতে পারলাম না। বলেছি, হায়ার সেকেণ্ডারিটা পাশ কর, তারপরে যা হোক করে একটা রেকর্ডপ্লেয়ার কিনে দেবো।'

'কিছুই বুঝতে পারছি না।' বিকাশ অসহায় ভাবে মাথা ঝাঁকালো, 'অথচ স্থির থাকতেও পারছে না। ঝুনুটা আমাকে পাগল করে ছাড়বে দেখছি। আচ্ছা মালা, তুমি কি ওর মধ্যে কোনো পরিবর্তন লক্ষ্য করেছো ?'

মালবিকা একটু ভাবলো, তারপর বললো, 'পরিবর্তন বলতে সেরকম কিছু চোখে পড়েনি। মাঝে মাঝে ওকে কেমন শুকনো আর গম্ভীর দেখায়। কিছু বলতে গেলেই রেগে যায়। গুম খেয়ে বসে থাকে। জিজ্ঞেস করলে প্রায় কিছু জবাবই দিতে চায় না। খুব চেপে ধরলে, খালি বলে, সব ডাটি, আমি আর বাড়ি থেকে বেরোব না, কারোর সঙ্গে মিশবো না, কারোর বাড়িও যাবো না। এ সব কথা থেকে সহজেই বোঝা যায় বন্ধুদের সঙ্গে ঝগড়া করে এসেছে। একদিন তো আমাকে সোজাসুজি বললো, মা আমার আর এখানে থাকতে ইচ্ছে করে না। বাবাকে বলো না, কোম্পানীর কলকাতার অফিসে ট্রান্সফার নিয়ে নিতে ?'

'তাই নাকি ?' বিকাশ অধিকতর চিন্তিত হয়ে পড়লো, 'এ কথাটা তো আমার মোটেই ভালো ঠেকছে না। তার মানে ওর আর এখানে থাকতে ইচ্ছে করছে না। নিশ্চয়ই ওর একটা কিছু মনে হয়েছে ? সেটা কী আমাদের জানতে হবে। শোন মালা, আমি একটা কাজ করি। সাইকেলটা নিয়ে আমি একবার বড় গ্রাউণ্ডে যাই, দেখি ঝুনু ওখানে খেলছে কি না। আর তুমি একটা কাজ কর তো। বন্ধুদের দেওয়া টাকা ও কি বন্ধুদের দেয় ? চুরি যদি করে, তাহলে এমনও হতে পারে, ও বাড়িতেই কোথাও সে টাকা লুকিয়ে রাখে। তুমি একটু খোঁজ করে দেখ তো। ওর বইয়ের টেবিলের ড্রয়ার বা বইয়ের ভেতর, কোথাও টাকা পয়সা পাও কী না ?'

বিকাশ চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লো। মালবিকাও উঠে দাঁড়ালো, 'দেখছি। আমি তো ওর ড্রয়ার ঘেঁটে এমনিতেই দেখি, টাকা পয়সা কিছুই চোখে পড়ে নি।'

বিকাশ পাজামা গেঞ্জির ওপরে একটা পাঞ্জাবী চাপালো। বাড়ির পিছনে রান্না ঘরের বারান্দায় রাখা সাইকেলটা নিয়ে বেরিয়ে পড়লো।

বিকাশ সেনের বাড়ি কলকাতার উত্তর উপকণ্ঠে। পৈতৃক বাড়ি। বাবা মা এখনও বেঁচে আছেন। ওর দুই দাদা কলকাতায় ভালো চাকরি করেন। ওকেই একমাত্র কলকাতার বাইরে, চাকরির জন্য প্রবাস জীবন যাপন করতে হয়। সেজন্য মনে কোনো দুঃখ বা ক্ষোভ ছিল না। চাকরিতে ওর ভবিষ্যৎ উন্নতির নিশ্চিত সম্ভাবনা আছে। তার থেকেও বড় কথা, ওর সংসারে কোনো অশান্তি নেই। ঝুনুর বয়স এখন ষোল। হায়ার সেকেণ্ডারিতে পড়ছে। পড়াশোনায় ভালো। হাসি খুশি। মুন্নাও সব দিক থেকে, মধ্যবিত্ত পরিবারে যেমন মানুষ হওয়া উচিত, তাই হচ্ছে। মালবিকার কোন অভিযোগ নেই। যা টাকা পায়, পাকা গিন্নির মতো সংসার চালায়। ঝগড়া বিবাদ মন কষাকষি কোন কিছুই পরিবারে নেই? তবু বলতে হবে, বিকাশ আর মালবিকা সুখী দম্পতি। সব মিলিয়ে নিরুদ্বেগ শান্তির সংসার। কিন্তু গত দেড় মাস ধরে ঝুনুর ব্যাপারে, ওদের শান্তিপূর্ণ সংসার তরী এক উত্তাল ঢেউয়ের মধ্যে আছড়ে পড়েছে। বাইরে থেকে সেটা বোঝা যায় না। কারণ বাইরের লোকে ওদের পুত্র নিয়ে সংকটের কথা কিছুই জানে না।

বিকাশ সাইকেল চালিয়ে, বড় গ্রাউণ্ডের ধারে রাস্তায় এলো। সাইকেল থেকে নেমে, গ্রাউণ্ডে ছেলেদের ফুটবল খেলার দিকে তাকালো। সে খুব ভালোভাবে লক্ষ্য করে দেখলো। খেলোয়াড়দের মধ্যে, ঝুনু কোথাও নেই। যে-সব ছেলেরা খেলা দেখছিল, বা আশেপাশে ঘোরাফেরা করছিল, তাদের মধ্যেও ঝুনু নেই। অথচ ঝুনু বাড়িতে মাকে বলে বেরোয়, ও বড় গ্রাউণ্ডে খেলতে যায়।

বিকাশ আরও ভালো করে খুটিয়ে প্রত্যেকটি ছেলেকে লক্ষ্য করে দেখলো। ঝুনু কি কোনোদিনই বড় মাঠে আসে না? মিথ্যা কথা বলে? তা হলে ও কোথায় যায়?

বিকাশ ভাবতে ভাবতে সাইকেলে উঠে, চারপাশে আস্তে আস্তে চক্কর দিতে লাগলো। হঠাৎ ওর চোখে পড়লো, এক জায়গায় রণধীর চোপরা আর সুরজিৎ সিং ছেলে দুটি এক জায়গায় বসে নিজেদের মধ্যে কথা বলছে। বিকাশ জানে, দুজনেই খুব বড় পোস্টের অফিসারের ছেলে। ঝুনু এদেরই নাম করে, এরাই না'কি ওকে টাকা রাখতে দেয়। বিকাশ একটু ভেবে, মনস্থির করে ফেললো। রণধীর আর সুরজিৎ, দুজনের সামনে সাইকেল থেকে নামলো। ওরা তাকালো বিকাশের দিকে! বিকাশ জানে দুজনেই পাঞ্জাবী। একজন হিন্দু, আর একজন শিখ্। সুরজিতের মাথায় পাগড়ির মতো ঝুঁটি বাঁধা। ইংলিশ মিডিয়ামে পড়া ছেলে। ঝুনুও তাই পড়ে। বিকাশ হেসে ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করলো, 'স্বপনকে তোমরা দেখেছো?'

স্বপন হলো ঝুনুর ভালো নাম। রণধীর আর সুরজিৎ স্বপনের বাপকে ভালোই চেনে। রণধীর বললো, 'ও তো আমাদের বাড়ি গেছলো, কিন্তু আমার সঙ্গে বেরোয় নি। আমার দিদি ওকে নতুন রেকর্ডের গান শোনাবে বলছিল। এখন হয়তো ও আমাদের বাড়িতেই আছে। ডেকে আনবো!'

'না না, কোনো দরকার নেই।' বিকাশ যেন একটু নিশ্চিন্তই হলো। তবু জানা গেল, বাজে কোনো লোকের সঙ্গে ঝুনু কোথাও যায় নি। চোপরা সাহেবের বাড়িতে, তাঁর মেয়ে ঝুনুর থেকে অনেক বড়। স্নেহ করে, ভালবাসে, তবে, এই সুযোগে সে সংকোচ কাটিয়ে বিব্রত হেসে বললো, 'তোমরা স্বপনের বন্ধু, আমি জানি। তোমাদের কাছ থেকে আমি একটা কথা জানতে চাই। আশা করি, তোমরা আমাকে সত্যি বলবে।

রণধীর আর সুরজিৎ অবাক চোখে বিকাশের দিকে তাকালো।

সুরজিৎ জিজ্ঞেস করলো, 'কী কথা বলুন তো? নিশ্চয়ই আমরা সত্যি কথা বলবো।'

'আচ্ছা, তোমরা কি স্বপনকে প্রায়ই দশ বিশ পঁচিশ টাকা রাখতে দাও?' বিকাশ তীক্ষ্ণ চোখে ওদের মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'আবার তোমাদের ও টাকা ফেরত দিয়ে দেয়?

রণধীর আর সুরজিৎ অবাক চোখে নিজেদের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় করলো। রণধীর বেশ দৃঢ় স্বরে বললো, 'না তো, আমরা তো এরকম টাকা স্বপনকে দিই না। ওকে টাকা রাখতেই বা দেবো কেন? ওকি সেরকম কিছু বলেছে?'

'না, এমনিই জিজ্ঞেস করলাম। বিকাশের মুখটা তখন কালো হয়ে উঠেছে। সে বুঝতে পারছে, তার মিথ্যা কথা ছেলে দুটি পরিষ্কার বুঝতে পারছে। কারণ ওদের চোখে সন্দেহ ও বিস্ময় ফুটে উঠেছে। বিকাশ বললো —মিথ্যা করেই বললো, 'টাকা কোনোদিন ওর কাছে দেখিনি। ও আমাদের মাঝে মাঝে বলে, আমার বন্ধুরা আমার কাছে টাকা রেখে দেয়। তাই জিজ্ঞেস করলাম। কথাটার মধ্যে তা হলে কোনো সত্যি নেই?'

একদমই না।' সুরজিৎ সজোরে মাথা ঝাঁকিয়ে বললো, 'আমরা স্বপনকে জিজ্ঞেস করবো তো, কেন ও এরকম ঠাট্টা করেছে।'

বিকাশ সাইকেলে উঠতে উঠতে বললো, 'হ্যাঁ, জিজ্ঞেস করো। স্বপন আমাকে আর ওর মাকে চটাবার জন্যেই বোধহয় এরকম মজা করে।'

বিকাশ সাইকেল চালিয়ে কোয়ার্টারগুলোর দিকে চললো। ওর মিথ্যা মধ্যবিত্ত ভদ্র হাসি আর মুখে নেই। শক্ত মুখ বিবর্ণ কালো হয়ে উঠেছে। ঝুনু এতদিন ধরে মিথ্যা বলে এসেছে, বাবা মাকে ঠকিয়েছে। অথচ ও এখনও লেখাপড়ায় সত্যি ভালো। এলাকার সমস্ত লোক-মহিলা পুরুষ নির্বিশেষে ওর প্রশংসা করে। তা হলে ঝুনু কতোটা খারাপ হলে, দিনের পর দিন বাবা মাকে মিথ্যা কথা বলে আসছে। এখন আর কোনো সন্দেহ নেই ও একটি পাকা চোর হয়েছে।

বিকাশ কোয়ার্টারের খোলা দরজা দিয়ে, সাইকেল নিয়ে ভিতরে ঢুকলো। বসবার ঘরের দরজা দিয়ে পিছনে যেতে গিয়ে দেখলো, খাবার টেবিলে মালবিকা মাথা ঠেকিয়ে বসে আছে। বিকাশ সাইকেল রেখে, খাবার ঘরে এলো। মালবিকা মুখ তুলে, বিকাশকে দেখে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো। টেবিলের ওপর পড়ে আছে একটা সাদা খাম। বিকাশ জিজ্ঞেস করলো, 'কী হয়েছে মালা ?'

'তুমি ভুল কিছু বলো নি।' মালবিকা কান্নারঙ্গ স্বরে বললো, 'আমি ওর বই খাতা ঘেঁটে এই খামটা বের করেছি। খাম ভরতি নোট। তুমি দেখ।'

বিকাশের মুখ আরও শক্ত ও কালো হয়ে উঠলো। খামটা খুলে দেখলো, দশ বিশ পাঁচ টাকার অনেকগুলো নোট। সব যোগ করলে তিন চার শো টাকার মতো হবে। তার মধ্যে একটা কাগজও রয়েছে। ঝুনুর নিজের হাতে ইংরেজিতে লেখা, 'লজ্জা আর ঘৃণা ভরা এই টাকা।' আর কিছু লেখা নেই।

তার মানে, চুরি ! সেন বংশের ছেলে একটি পাকা চোর। নিজের অপরাধের কথা লিখে রাখতেও ভুল করে নি। রাগে দুঃখে বিকাশের চোখ দুটোও ছলছল করে উঠলো। তারপরেই তার মুখ ভয়ংকর হয়ে উঠলো। হাতের ঘড়ি দেখলো। সাড়ে ছটা বাজে। বাইরে তখনও দিনের আলো আছে। তবে সন্ধ্যা আসন্ন। ঝুনুর আসবার সময় হয়েছে। মুন্না ঘরে ঢুকেছে।

বিকাশ বাঘের চাপা গর্জনের স্বরে বললো, 'মালা, তোমাকে আমি অনুরোধ করছি, তুমি মুন্নাকে নিয়ে ঘণ্টাখানেকের জন্য কারোর বাড়িতে বা যেখানে খুশি একটু ঘুরে এসো। আমি ঝুনুর সঙ্গে আজ একটা হেস্তনেস্ত করবো।'

মালবিকা কিছু বলবার চেষ্টা করলো। বিকাশ টাকার খামটা ঝটিতি পাঞ্জাবীর পকেটে ঢুকিয়ে বললো, 'প্লিজ মালা, আমার কথা রাখ। তুমি মুন্নাকে নিয়ে কোথাও চলে যাও। মুন্নার সামনে আমি

কোনো সিনক্রিয়েট করতে চাই না। তুমি ওকে নিয়ে চলে যাও।'

মালবিকার দুই-চোখে উদ্বেগ ও ভয়। কিন্তু বিকাশের মূর্তি দেখে কিছু বলতে সাহস পেলো না। চোখের জল মুছে, মুন্নাকে নিয়ে সে বেরিয়ে গেল।

বিকাশ প্রতিটি মিনিট খাঁচায় বন্দী বাঘের মতো বাইরের ঘরে পায়চারি করতে লাগলো। টেবিলের ওপর পড়ে আছে একটা পুরনো ছাতার বেতের লাঠি। সে ঘন ঘন বাইরে তাকাচ্ছে, আর ক্রমাগত মুখ কঠিন হয়ে উঠছে। চোখ লাল। সে যেন স্বাভাবিক নেই।

ঝুনু ঘরে ঢুকলো ছ'টা চল্লিশ মিনিটে। ছিপছিপে স্বাস্থ্যবান ষোল বছরের কিশোর। মুখে এখনও গোঁফের রেখা দেখা দেয় নি। মায়ের বংশের মতোই লম্বা গড়ন পেয়েছে। মালবিকা ওকে ট্রাউজার পরতে দেয়। লাল ডোরা কাটা শার্ট, বটল গ্রীন ট্রাউজার পরা ঝুনু ঘরে ঢুকলো। নিষ্পাপ সুন্দর মুখ। মাথায় একমাথা কালো চুল। যেন খেলেই ফিরছে, এরকম উসকো খুসকো ভাব। নিজের হাতেই সুইচ টিপে আলো জ্বালিয়ে বললো, 'এখনো আলো জ্বালো নি? মা কোথায়?'

বিকাশ কোনো জবাব না দিয়ে, বাইরের ঘরের দরজাটা সজোরে বন্ধ করে, ছিটকিনি আটকে দিল। ঝুনু বাবার মুখের দিকে না তাকিয়ে খাবার ঘরে গিয়ে সুইচ টিপে আলো জ্বালিয়ে, শোবার ঘরে ঢুকলো। সেখানেও আলো জ্বালিয়ে, অবাক স্বরে বললো, 'একি মা বাড়িতে নেই নাকি?'

বিকাশ ঘরে ঢুকে বললো, 'না নেই।'

বিকাশের হাতে সেই ছাতার বাটের বেতের লাঠি। দু চোখ ধক ধক জ্বলছে। পকেট থেকে খামটা বের করে ঝুনুর দিকে বাড়িয়ে দিল। ঝুনু অবাক চোখে বাবার দিকে তাকিয়ে খামটা নিল। এই প্রথম লক্ষ্য করলো, বিকাশের জ্বলন্ত চোখ মুখ। বিকাশ কেবল দাঁতে দাঁত পিষে উচ্চারণ করলো, 'মিথ্যুক। চোর!'

বলে অন্ধের মতো সেই শক্ত মোটা বেত দিয়ে ঝুনুকে পেটাতে আরম্ভ করলো। এই আকস্মিক আক্রমণে ঝুনু যেন তেমন অবাক হলো না। মার খেতে খেতে এক সময়ে বিছানায় ঝাঁপিয়ে পড়লো। বিকাশ তবু থামলো না। সপ্ সপ্ শব্দে পিটিয়েই চললো। ঝুনু ক্রমেই কুঁকড়ে যেতে লাগলো। মুখে গালে বাড়ি খেয়ে, ঠোঁট নাক দিয়ে রক্ত পড়ছে।

বিকাশ দম নেবার জন্য থামলো, 'এত দিন ধরে এই মিথ্যাচার? মিথ্যুক, চোর। তুই একটা চোর! আর এখনো তোর মা তা বিশ্বাস করে না? আমি তোকে খুন করে আজ জেলে যেতেও রাজি, তবু তোকে ছাড়বো না। কোথা থেকে, কাদের বাড়ি থেকে এ টাকা চুরি করেছিস, বল।'

ঝুনুর পক্ষে জবাব দেওয়া সম্ভব ছিল না। বিকাশ জানতো না, উগ্র হয়ে সে কী প্রচণ্ড মার মেরেছে ছেলেকে। সে আবার বেতটা তুলতে গিয়ে দেখলো, ঝুনুর লাল ডোরা কাটা জামার কাঁধ পিঠে রক্তে ভিজে উঠেছে। বিকাশ থামলো, 'এখনো বল, কোথা থেকে তুই এ টাকা চুরি করেছিস? এ চোরাই টাকা দিয়ে তুই দামী চকোলেট কিনে আনতিস। আর বন্ধুদের নাম করে আমাদের মিথ্যে কথা বলতিস।'

'আমি চুরি করি নি।' ঝুনুর গোঙানো স্বর শোনা গেল, 'বাবা তুমি আমাকে মেরে ফেলতে পারো, কিন্তু আমি চোর নই, চুরি করি নি।' বলতে বলতে ঝুনু যন্ত্রণায় বিছানায় মুখ গুঁজে দিল।

বিকাশ সন্দিগ্ধ চোখে তাকিয়ে রইলো। দেখলো, ঝুনুর জামার লাল ডোরায় রক্তে মেশামেশি হয়ে যাচ্ছে। সে বেতটার দিকে একবার তাকালো। বললো, 'তাহলে এ টাকা তুমি কোথা থেকে পেয়েছো। আমি সত্যি কথা শুনতে চাই।'

ঝুনু কিছুক্ষণ পড়ে থেকে, মুখ ফিরিয়ে বললো, 'এ সব টাকা আমাকে দিয়েছেন শ্রীবাস্তব আন্টি, কেলকার আন্টি, চোপরা বহেন, রতিদিদি, মৃদুলা কাকীমা। তাঁরা আমাকে চকোলেটও দিতেন।'

বিকাশ অবিশ্বাস্য চোখে তাকিয়ে বললো, 'কেন এঁরা তোমাকে টাকা চকোলেট দিতেন।

ঝুনু চুপ করে রইলো। বিকাশ দেখছে, ঝুনুর শরীর যন্ত্রণায় কুঁকড়ে উঠছে। বিকাশের উগ্র ক্রোধ আর নেই। বরং মনের গভীরে একটা কষ্ট বোধ জেগে উঠছে। জিজ্ঞেস করলো, 'বল কেন ওরা তোকে টাকা চকোলেট দিতেন ?'

'তোমাকে আমি সে কথা বলতে পারবো না বাবা।' ঝুনু গোঙানো স্বরেই বললো, 'খুব নোংরা ব্যাপার। আমার আর এই নরকে থাকতে ইচ্ছে করছে না।' বলেই ও কান্নায় ফুলে ফুলে উঠলো।

বিকাশ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। চোখে তার গভীর বিস্ময় ও অন্যমনস্কতা। মনে পড়লো, টাকার খামে লিখে রাখা ঝুনুর সেই কথা, 'লজ্জা আর ঘৃণা ভরা এই টাকা।' মুহূর্তেই বিকাশের চোখের সামনে থেকে একটা পর্দা সরে গেল। তার চোখের সামনে ভেসে উঠলো, মিসেস শ্রীবাস্তব, মিসেস কেলকার, মিস চোপরা, মিঃ ঘোষের স্ত্রী মৃদুলার চেহারা। সে দেখতে পেলো, ঐ সব ভদ্রমহিলারা তাদের ক্ষুধা মেটাবার জন্য কী ভাবে একটি নিষ্পাপ ছেলেকে নিজেদের শিকার করে তুলেছে। ঘৃণায় তার সর্বাঙ্গ কুঁকড়ে উঠলো। এই কলোনী জীবনের সাজানো গোছানো সুন্দর, শিক্ষায় দীক্ষায় সংস্কৃতি সম্পন্ন সমাজের সেই নগ্ন চেহারাটা তাকে যেন কাঁপিয়ে দিল। মনে তার অসহায় অবাক জিজ্ঞাসা, এ কোন সমাজে আমরা বাস করছি? বাইরে থেকে যার কিছুই চেনা যায় না, বোঝা যায় না। অদৃশ্যে গভীরে সরীসৃপের মতো ক্লেদাক্ত জীবেরা বিচরণ করছে। অথচ বাইরে তারা কী আশ্চর্য নিটোল সুন্দর।

কলিং বেল বেজে উঠলো। বিকাশ ঝুনুর দিকে একবার দেখে, বাইরের ঘরে গেল। হাতের বেতটা ছুঁড়ে ফেলে দিল। দরজা খুলে দিল। মালবিকা উৎকণ্ঠিত জিজ্ঞাসু চোখে বিকাশের দিকে তাকালো। বিকাশ জবাব দিতে গিয়ে দেখলো, সে কথা বলতে পারছে না। গলায়

তার স্বর নেই। তার দুই চোখের কোণে জল চিকচিক করে উঠলো। কোনোরকমে উচ্চারণ করলো, 'মালা তুমি একটু ঝুনুর কাছে যাও। ও যে কেন বলতো, এখানে থাকতে চায় না, সেটা বড় দেরিতে বুঝলাম। আমি আগামীকালই আমার ট্রান্সফারের জন্য আবেদন করবো। ঝুনুকে নিয়ে দু একদিনের মধ্যেই আমি কলকাতায় যাবো। ওকে সেখানেই রেখে আসবো। তুমি যাও ওর কাছে।'

বিকাশ বসবার ঘরের একটা চেয়ারে ধপাস করে বসে পড়লো। মুখ ঢাকলো দুহাতে। মালবিকা ছুটে ঝুনুর কাছে গেল। দেখলো রক্তাক্ত ঝুনু বিছানায় পড়ে আছে। মালবিকা একটা আর্তধ্বনি করে, ঝুনুর গায়ের কাছে উপুড় হয়ে পড়লো, ডাকলো 'ঝুনু।'

ঝুনু মা'কে দেখে, দু হাতে মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে হু হু করে কেঁদে উঠলো।

হতভাগ্য শিকার